# রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা।

( বিশেষ সংখ্যা )



শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
ধর্ম্মভূষণ মহাশয়ের সম্পাদনায়—

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ মন্দির হইতে কবিশেখর শ্রীপ্রকাশচন্দ্র চৌধুরী
সহকারী সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
বঙ্গাব্দ ১৩৪৮।

বিশেষ সংখ্যা বিধায় মূল্য ১৲ মাত্র।

রঙ্গপুর কালীকৃষ্ণ মেশিন প্রেস হইতে
শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

# রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা।

( ত্রৈমাসিক )

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীকেশবলাল বসু, বিদ্যাবিনোদ, সাহিত্যরত্ন

## —সূচী—

# রবীন্দ্র প্রসঙ্গ

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী—ধর্ম্মভূষণ, সম্পাদক

অপ্রত্যাশিত রবীন্দ্রপ্রয়াণে বিক্ষুব্ধ বিদগ্ধমণ্ডলে আজ যে প্রসঙ্গ, যতই অন্তঃসারশূন্য হউক না কেন, প্রসিদ্ধিলাভ করিবে, আমি তাহারই অবতারণা করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। সে আজ অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বের কথা আমাদের প্রেসিডেন্সি কলেজে পাঠদ্দশায় রবীন্দ্র দর্শনের প্রথম সুযোগ ঘটে। অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষা বশে সেই বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যায়তনের সোপানাবলী প্রতিদিন অতিক্রম করিয়া যে মনিষীদিগের সারগর্ভ এবং গুরুগম্ভীর পাঠদান আজও আমাদের বার্দ্ধক্যের অর্দ্ধবধির শ্রবণে ধ্বনিত হইতেছে, সেই প্রাতঃস্মরণীয় অধ্যাপক মণ্ডলীর নাম সসম্ভ্রমে উচ্চারণ করা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তদানীন্তন প্রেসিডেন্সি কলেজে মহামতি স্যর চার্ল্স্ টনি, মিঃ জন উইলসন, মিঃ প্রোথেরো, মিঃ পার্সিভাল মিঃ পি. কে রায়, আচার্য্য স্যর জগদীশচন্দ্র বসু, ডাঃ স্যর পি, সি, রায়, মিঃ বিপিন বিহারী গুপ্ত, শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ মজুমদার, শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পণ্ডিত হরিশচন্দ্র কাব্যব্যাকরণন্যায়তীর্থ প্রভৃতি মহামনিষীদিগের স্মৃতি আজও আমাদের মানস পটে দৃঢ় অঙ্কিত রহিয়াছে।

আদর্শ চরিত্র বিচারপতি ডাক্তার স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার ছিলেন। ছাত্রদিগের নৈতিক চরিত্র গঠন, ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতানুরাগ বৃদ্ধির পক্ষে তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টা তখন আমাদের মনে যে রেখাপাত করিয়াছিল আজও তাহা ক্ষীণ হয় নাই। এই মহানুভবের নারিকেলডাঙ্গাস্থিত বাসভবনে ছাত্রগণ মধ্যে মধ্যে নিমন্ত্রিত হইয়া শ্রীভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিত এবং পরিশেষে নারায়ণের প্রসাদ গ্রহণ পূর্ব্বক পূতচিত্ত হইয়া নিজ নিজ আবাস স্থলে ফিরিয়া আসিত। ইথার তরঙ্গের আবিষ্কার ও প্রদর্শনী, তখন এই প্রেসিডেন্সি বিজ্ঞানশালায় আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়া তাঁহার ছাত্রমণ্ডলী ও কলিকাতা বিদ্বৎসমাজকে চমৎকৃত করিয়াছিল। বাঙ্গালার মসনদে তখন স্যর জন এলিয়ট বাহাদুর শাসনকর্ত্তারূপে সমাসীন ছিলেন। তিনিও ছাত্রপ্রীতির যে সকল পরিচয় দিয়াছিলেন তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ভাগিরথী বক্ষে রাজকীয় বাষ্পীয় তরণী 'রোটাসে' ছাত্রগণ সহ জল ভ্রমণের অপূর্ব্ব ব্যবস্থা। এই অনুষ্ঠানে সেকালের ভূস্বামীবর্গের নেতৃস্থানীয় মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, উত্তরপাড়ার কৃতবিদ্য রাজা প্যারীমোহন

মুখোপাধ্যায় সংস্কৃত কলেজের প্রধানাধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকগণ—সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়া যোগদান করিয়াছিলেন। লাটবাহাদুর সস্ত্রীক উপস্থিত থাকিয়া সকলকে অভ্যর্থনা এবং ছাত্রদিগের প্রায় প্রত্যেকের সহিত পরিচিত হওয়ার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। বসন্তকালের মধুজ্যোৎস্নাপ্লাবিত ভাগিরথী বক্ষে রাজকীয় সুরযন্ত্রীদিগের ঐক্যতানের তরঙ্গায়িত সুর লহরীর তালে তালে 'রোটাসের' রঙ্গনৃত্য যাঁহারা উপভোগ করিয়াছেন তাঁহারা আজও তাহা ভুলিতে পারেন নাই। তরণী বক্ষে দেশী ও বিদেশীয় প্রথায় জলযোগের ব্যবস্থাও প্রচুর ছিল। কিন্তু আদর্শ ভারতীয় ভাবাপন্ন তাৎকালিক শিক্ষা দীক্ষার কর্ণ-ধারগণের সমক্ষে অতি স্বল্প সংখ্যক শিক্ষাব্রতীদিগের পক্ষে ভিন্ন দেশের আহার্য্য গ্রহণে আগ্রহ দেখা যায় নাই। অধিকাংশের রুচি ভিন্নদেশের আহার্য্য লোলুপ দেখিয়া বাঙ্গালী জাতির ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের প্রতি লাট বাহাদুর তাঁহার বিদায় সম্ভাষণে বিশেষভাবে অত্যন্ত কঠোর উক্তি করিয়াছিলেন।

এইরূপ পরিবেশের মধ্যে, রুচি বিকারের আবর্ত্তে, যখন বাঙ্গালীজাতি হাবুডুবু খাইতেছিল, মাতৃভাষার আলোচনা দূরের কথা তাহার সর্ব্বতোপরিহার ও বিদেশীয় ভাষায় মনোভাব প্রকাশের প্রাচুর্য্যের মধ্যে, স্বদেশীয় কবিগণের বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী হইবার জন্য আকুল আহ্বান যখন বিফল হইয়াছিল, ঠিক তখনই কবি কালীচন্দ্রের উৎসাহ বাণী

“আধুনিক যুবাজনে স্বদেশীয় কবিগণে
ঘৃণা করে নাহি সহে প্রাণে।
বাঙ্গালীর মনঃপদ্ম কবিতা সুধার সদ্ম
এই মাত্র রাখহ প্রমাণে॥”

শ্রবণ করিয়া কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার প্রখ্যাত কাব্য “পদ্মিনী উপখ্যান” রচনা করিয়া বাঙ্গালার আদর্শ, বাঙ্গালীর হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তৎসমসাময়িক মাইকেল মধুসূদনের মেঘমন্দ্র সদৃশ “মেঘনাদবধ কাব্য” এবং বঙ্কিমচন্দ্রের বাঙ্গালা গদ্য রচনায় যে যুগান্তর সূচিত হয় তাহাতে বৈদেশিক ভাবাপন্ন রবীন্দ্রনাথেরও দৃষ্টিভঙ্গির এক অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইয়াছিল। তাঁহার পূর্ব্ব রুচি বিকারের প্রায়শ্চিত্তরূপে বাঙ্গলার কবিগুরুকেও সেকালে কম কষাঘাত সহ্য করিতে হয় নাই। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রমুখ সমালোচকেরা তাঁহাদের স্বভাব সুলভ তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ প্রয়োগে কবিগুরুকে বিদ্ধ করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। ইহার পর হইতে কবিবরের, বঙ্গ জননীকে ভারতীয়ভাবে ভূষিত করিয়া বিশ্ব মোহিত করার শক্তি জাগিয়া উঠিয়াছিল সন্দেহ নাই। বিশ্বসভায় তিনি যে সম্মান লাভ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার এই প্রস্ফুটিত দেশ প্রীতিরই পুরস্কার, ইহা বলিতেই হইবে।

১৩১২ বঙ্গাব্দে কবিগুরু বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সহঃ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত

করিয়াছিলেন। তখন মাননীয় বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র মহাশয় সভাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত। ১৩১১ বঙ্গাব্দে যখন শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় পরিষদের সভাপতি, তখন কবিগুরু পরিষদের অন্যতম নেতা ও পরম হিতৈষীরূপে উহার কর্ম্মক্ষেত্রের পরিধি বিস্তারের জন্য এক নূতন প্রস্তাব পরিষদে উপস্থিত করেন। ঠিক সেই সময়েই অর্থাৎ ১৩১১ বঙ্গাব্দের ১৬ই ফাল্গুন তারিখে আমরাও একটি ক্ষুদ্র প্রস্তাব পাঠাইয়াছিলাম। তাহার মর্ম্ম যথা ;—"বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রসার বৃদ্ধি এবং বঙ্গের ঐতিহাসিক উপকরণ ও প্রাচীন কাব্যাদি সংগ্রহের জন্য প্রতি জেলায় উহার একটী করিয়া শাখা স্থাপিত হউক।" এই উভয় প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনার জন্য ১৩১১ বঙ্গাব্দের ৬ই চৈত্র তারিখে পরিষদের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির একটী বিশেষ অধিবেশন আহুত হয়। উপস্থিত প্রস্তাব দুইটিই অত্যাবশ্যকীয় এবং আমাদের প্রস্তাবটি কবিগুরুর প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিবে বিবেচনায় পরিষদ বহু আলোচনার পর এই উভয় প্রস্তাবই গ্রহণ করেন। তাহারই ফলে রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের পরিকল্পনা। ১৩১২ সালে রঙ্গপুর শাখা প্রতিষ্ঠিত এবং আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রলোকের উপরেই তাহার কর্ম্মভার ন্যস্ত হয়। ( ১৩১৪ সালের সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার পৃঃ ৮৩—৪ এবং পরিষদ্-পরিচয় পৃঃ ৬২ )।

এই ক্ষুদ্র পরিষদের পূর্ণ যৌবনে যখন তাহার প্রতিভার পরিচয় বঙ্গের দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়ে তখনই এই পরিষৎ অনুষ্ঠিত উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের পাবনা অধিবেশনে, বিশ্বসভার সম্মান লাভের পরে পরেই, কবিগুরু নিজ হাতে গড়া এই প্রতিষ্ঠানকে তাঁহার সর্ব্বোচ্চ সম্মানের ভাগী করার জন্য যোগদান করিয়াছিলেন। সাহিত্যক্ষেত্রে খ্যাত মহারাজা স্বর্গীয় জগদীন্দ্রনাথ রায় মহাশয় সেই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। কবিগুরু আক্ষেপ করিয়া বলেন 'যখন বিদেশ তাঁকে চিনিল স্বদেশবাসী তখনই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল, তার পূর্ব্বে নহে।" বস্তুতঃ বাঙ্গলার এই দুরপনেয় কলঙ্ক যাইবার নহে। তাঁহার বিয়োগে আজ সেই কথা নূতন করিয়া মনের কোণে জাগাইয়া বাঙ্গালীকে ব্যথা দিতে হইতেছে সন্দেহ নাই।

১৩২০ বঙ্গাব্দের, ১০ই ফাল্গুন, রবিবার উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের পাবনা অধিবেশনে কবি সম্ভাষণে সুসাহিত্যিক সুরাজ সম্পাদক স্বর্গীয় কিশোরীমোহন রায় মহাশয়ের উত্থাপিত এবং ডকটর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয়ের সমর্থিত নিম্নোক্ত প্রস্তাবের উত্তরে কবিগুরু বিনীত অপিচ অভিমানব্যঞ্জক যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

**প্রস্তাব।**

"কবিগুরু শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বিখ্যাত নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনে সমবেত সাহিত্যিকবৃন্দ আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন।"

এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে, কবিবর বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সুললিত ভাষায় বলিলেন,—"আমার প্রতি সভা যে ভার ন্যস্ত করিয়াছেন, তাহা বহন করা কঠিন। ইহাকে আমি নিষ্ঠুরতা বলিয়া মনে করিতেছি। আমাকে সম্মানের দ্বারা সৎকার করা যে কেন হয়, তাহা বুঝি না। মৃত্যুর পরে এরূপ সৎকার করিলে সহ্য হইতে পারে, কিন্তু জীবিত অবস্থায় ইহাকে অত্যাচার বলিয়াই মনে করিতেছি। আমার প্রতি যে সকল বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা গ্রহণ করা শক্ত। ভালমন্দ কিছুই জানি না। আমি অন্তরের সঙ্গে জানাইতেছি, নিন্দা, স্তুতি দুই-ই আমার পক্ষে গ্রহণ করা কঠিন। আমাকে যে আপনারা আপনাদিগের মধ্য হইতে পৃথক করিয়া ফেলিয়াছেন, আমি যে আর একটা কিছু হইয়াছি, এ আমার পক্ষে বড় যাতনার বিষয়, আমার এক গালে চূণ ও অপর গালে কালি। নিন্দা ও স্তুতির কোলাহল সহ্য করিতে পারিতেছি না। বিলাতে একদল বালক আছে, তারা কুকুর পেলেই তার লেজে টিন বেঁধে দেয়। কুকুর স্থির থাকিতে পারে না। তাহার দৌড়ের সঙ্গে টিনও বাজিতে থাকে। আমারও পেছনে এমনি একটা খণ্ড বেঁধে দেওয়া হয়েছে। আমিও আর স্থির থাকিতে পারছিনা। আমি সুদূর প্রদেশের এক কোণে একলা থাকতে চাই, কিন্তু আমাকে ঠিক হয়ে থাকতে দেওয়া হয় না। আমি এবার বহুতর অনুরোধ করেছিলাম, আমাকে নিয়ে আর কোলাহল করবেন না, আমাকে আর সভাতে টেনে আন্‌বেন না। যাকে আমি নিতান্ত বন্ধুর মত মনে করি, তিনিই আজ আমার উপরে বাদ সাধ্‌লেন। আর আপনারা তারই সঙ্গে যোগ দিলেন। আমি বাল্যকাল থেকে সাহিত্যের সেবা কোরে এসেছি। যদি তার জন্য পুরস্কার পেয়ে থাকি, যদি কিছু সম্মান পেয়ে থাকি আপনারা সকলে ভাগ করে নিন্‌। এ সম্মান আমার একার নহে। এত বড় সম্মানের ভার যখন আপানারা সকলেই ভাগ করে নেবেন, তখন আমার অনেক সুখ নিশ্চয়ই হবে। বৎসর বৎসর সাহিত্যের যে যজ্ঞ হইতেছে, সেই যজ্ঞক্ষেত্রে আমায় যে সম্মান কোর্‌লেন, তার অধিক সম্মান আর কোথাও পাবনা। এই যে আমার সম্মানে আপনারা আনন্দ অনুভব কর্‌লেন, ইহাই আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার; আমার পক্ষে গৌরবের কথা। আমি নিজকে দেশের ও সাহিত্যের হাতে সমর্পন করিয়াছি, তাহার নিমিত্ত আজ আমি এখানে যাহা পাইলাম, তাহাই আমার সর্ব্বাপেক্ষা বড় জিনিষ। ইউরোপে সম্মান পাইয়াছি, কিন্তু আজ সাহিত্যের মন্দিরে যে নির্ম্মাল্য পাইলাম, তদপেক্ষা বড় বোধ হয় সে সম্মান নহে। আমি কি করিয়াছি। তাহা কাল বিচার করুক। আজি এই কর্ম্মক্ষেত্রের লাভই আমার পরম সৌভাগ্য। শস্যশ্যামলা পদ্মাতীরে আমার যে সৌভাগ্যের উদয় হইল, তাহা চিরদিন মনে থাকিবে। আমার একলার পক্ষে সে সম্মান, সে সৌভাগ্য বহন করা কঠিন। সকলের সঙ্গে আমি এ সম্মান বহন করিব।—

( উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন, সপ্তম অধিবেশন পাবনা কার্য্য বিবরণ ৫২ পৃষ্ঠা। )

ইহার পরে উক্ত সম্মেলনের পরিসমাপ্তিকালে ঐতিহাসিকবর বাগ্মী স্বর্গীয় অক্ষয় কুমার

মৈত্রেয় পঞ্চানন মহাশয়ের অনুরোধে কবিগুরু যে শেষ উপদেশ দিয়াছিলেন সাহিত্যিক মাত্রেরই সেই বাণী এখানে অমোঘ ও মর্ম্মবাণীরূপে গ্রহণযোগ্য। উক্ত সম্মিলনের কার্য্য বিবরণ হইতে আমরা তাহাও উদ্ধৃত করিতেছি ;—"উপদেষ্টার স্থান গ্রহণ করা বড় শক্ত কথা। আমি সাহস করিয়া এ ভার গ্রহণ করিতে পারি না। সাহিত্য-সম্মিলনের উৎস স্বয়ং উৎসারিত হইয়াছে। ইহা কাহারও কথার উপর নির্ভর করে নাই। অন্তরের অন্তর হইতে এই অমৃত ধারা উৎসারিত হইয়া আমাদিগের তৃষ্ণা নিবারণ করিতেছে। সরল পথ গ্রহণ পূর্ব্বক আমাদিগকে চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত এই অমৃতধারা প্রাণ শক্তি উদ্বোধিত করিয়া নিয়ত ধাবিত হইতেছে। কাহারও অপেক্ষা না করিয়া এই অমৃতধারা এখন নানা পথে ছড়াইয়া পড়িবে। কোথা হইতে কিরূপভাবে এই উৎস সঞ্চারিত হইল, তাহার কারণ স্থির করা অসম্ভব। বিদেশ হইতে আমরা অনেক জিনিষ অনুকরণ করিয়াছি। আমরা অনেক নকল জিনিষও বহন করিতেছি ; কিন্তু এই সাহিত্য উৎসের মধ্যে কোন নকলের ভাব নাই। এভাব আপনা আপনি দেশের মধ্যে মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উঠিয়াছে। নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাদিগকে মানুষ করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু ইহাতেও বাধা বিপত্তির অভাব নাই। সেই বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়া আমাদিগকে মানুষ হইয়া উঠিতে হইবে। আমাদিগের মধ্যে লুক্কায়িত এক শক্তি এতদিন আত্ম প্রকাশ করিতে পারে নাই। আজ সুসময়ে সেই শক্তি আমাদিগের মাতৃভাষাকে, সাহিত্যকে অবলম্বন করিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা বিধাতার দান, মাতৃভূমির অনুপ্রেরণা ; ইহা যদি আমরা বুঝিতে পারি, তাহা হইলে মানুষ হইতে বিলম্ব হইবে না। এই শক্তিধারা জাহ্নবীর ধারার মত আপন পথ আপনি স্থির করিয়া প্রবাহিত হইবে ; তজ্জন্য কাহারও চেষ্টা বা উপদেশ প্রদান করিবার প্রয়োজন হইবে না। আমাদিগের সর্ব্ববিধ মিলনের স্থান ভাষা। ইহার কাছে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম নাই, আমরা কখনই পৃথক নহি। আমাদিগের মধ্যে শত ছিদ্র আছে, তদ্দ্বারা আমাদিগের শক্তি হ্রাস হইতেছে। হয়ত বা কোন দিন ঐ ছিদ্র দিয়া শনি আসিয়া আমাদিগের সম্মিলন পণ্ড করিয়া দিবে। আমাদিগের মিলন বন্ধন তখন উদ্বন্ধনে পরিণত হইবে। তবে সুখের বিষয় এই যে, সাহিত্যিকেরা যিনিই যে স্থরে বসিয়া সাধনা করিতেছেন, করুন। কিন্তু একটি স্থানে সকলকে আসিয়া একসঙ্গে মিলিতে হইবে। উহা মুক্তির স্থান। সম্মিলনই সেই পবিত্র মুক্তির স্থান। এস্থানে ভেদ জ্ঞান থাকিতেই পারে না।"

কবিগুরুর সহিত রঙ্গপুর শাখার সংশ্রব এইখানেই শেষ হয় নাই। তিনি আজীবন উহার প্রত্যেক অনুষ্ঠানের সাফাল্য কামনা করিয়া উৎসাহ দান করিয়া গিয়াছেন। স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী যখন এই পরিষদের আহ্বানে ১৩৩০ বঙ্গাব্দে (১৯২৩) রঙ্গপুরে শুভাগমন করিয়া উহার চিত্রশালার দ্বারোদ্ঘাটন এবং উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের পৌরহিত্য করিয়াছিলেন তখনও কবিগুরু পরিষদের সেই গৌরবময় পর্য্যায়ে পর্য্যাপ্ত উৎসাহ

ও আনন্দের বাণী শুনাইয়াছিলেন। আশুতোষের সেই স্মরণীয় ভাষণ আজও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে গণ্য হইয়া পাঠার্থীদিগকে বাঙ্গালা ভাষানুরাগী করিতেছে। আশুতোষ, প্রারম্ভে প্রাচীন কবির কথায় মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন ;—

"নানান দেশের নানান ভাষা
বিনে স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা।"

তাঁহার এই বাঙ্গালা ভাষানুরাগের মূলেও কবিগুরুর অনুপ্রেরণা যথেষ্ট ছিল। বাঙ্গলাকে এমন করিয়া ভালবাসিবার—এমন করিয়া প্রচার করিবার চেষ্টা রবীন্দ্রের আগে কেহ করিয়াছেন কিনা জানি না। তিনি সার্থক গাহিয়াছেন ;—

"আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় বড় ভালবাসি।"

এ কথা তাঁহার মুখের নহে, অন্তরের। এত করিয়া যাহাকে ভালবাসিতেন তাহার আসন তিনি বিশ্বসভাতে পাতিয়া গিয়াছেন। আজ বাঙ্গলা ভাষা জন্মরেণ্য এবং তাঁহার ও অন্যান্যের রচিত বহু বাঙ্গলা গ্রন্থ নানা বিদেশীয় ভাষায় অনুদিত হইয়াছে ও হইতেছে। বঙ্গভারতী আজ বিশ্ব ভারতীতে পরিণত হইয়া বিশ্বের ভাব ধারার অন্যতম উৎসরূপে গণ্য এবং পূজিত হইতেছে। তাঁহার মহাপ্রয়াণ আজ বিশ্বকে বিক্ষুব্ধ করিয়াছে। ধন্য রবীন্দ্র! তোমার তিরোধানে শোক অপেক্ষা সান্ত্বনা ও স্বস্তি যুগপৎ মনে উদয় হইতেছে। তুমি চিরজীবি, মৃত্যুঞ্জয়!

ওম্ শান্তিঃ ওম্ শান্তিঃ ওম্ শান্তিঃ।

# রবীন্দ্রনাথ

শ্রীমুণীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী—এম্, এ, বি, এল্

এই ক্ষুদ্রায়তন অনুষ্ঠানটি একটি বিদ্বৎ-সভা। সংখ্যালঘিষ্ঠ হ'লেও এর জ্ঞান গরিষ্ঠতা স্বীকার কর্ত্তেই হবে। এখানে কিছু বলা বিশেষ সম্মানের বিষয়। আপনারা আমাকে সেই সম্মানের কাজে আহ্বান করায় আমি নিজেকে ধন্য মনে করি এবং এজন্য আপনাদের আমার অন্তরের ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু সম্মান শুধু পেলেই হয় না। ওর যোগ্যতা থাকা দরকার। আমার সেই যোগ্যতার একান্ত অভাব, কেননা আমি না বক্তা, না সাহিত্যিক। ঝোঁকের মাথায় আপনারা আমাকে বক্তৃতা দিতে ডেকেছেন, তুল্য ঝোঁকের মাথায় আমি বক্তৃতা দিতে সম্মত হয়েছি,—কোন পক্ষই গুরুত্ব উপলব্ধি করি নাই। এখন যতই সময় এগিয়ে আস্‌ছে ততই আমার অবস্থা অর্জ্জুনের মত হয়ে দাঁড়াচ্ছে,—গাণ্ডীবংস্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিশুষ্যতি। আপনারা নিজগুণে আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে নেবেন এই ভরসা। বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ সকলেরই প্রিয়। তাঁর সম্বন্ধে আমরা অভিন্ন-হৃদয়। এই অনুষ্ঠানটি তাঁর সম্বন্ধে আমাদের Congregational prayer এর মত। বৈদিক মন্ত্রের ভাষায় বল্‌তে হয়,—সংবদধ্বং সংগচ্ছধ্বং সংবো মনাংসি জানতাং।

আজ রবীন্দ্রনাথের বহুল প্রচারের দিন এসেছে। জীবনে যিনি মহান্ ছিলেন আজ লীলাচৈতন্যময় জীবনের অবসানে তিনি মহতোমহীয়ান্ হয়েছেন। সুতরাং বাংলার সুদূর প্রান্ত-স্থিত এই সহরে সংখ্যালঘু এই নিভৃত অনুষ্ঠানটি আজ যে আলোচনার সূচনা করেছে তা এখানেই থেমে যাবে এ মনে করার কোন কারণ নাই। বরং এখানে যে সূচনা ও সূত্রপাত হয়েছে যুগ যুগ ধরে, শতাব্দীর পর শতাব্দী, সেই আলোচনা চল্‌তে থাক্‌বে এই মনে করাই যুক্তিসঙ্গত হবে। বিশেষতঃ আজ বিশ্বময় যে দারুণ নরমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হচ্ছে তার অগণিত তনুপাতের পর যেদিন সেটি সাঙ্গ হবে সেদিন মানুষের অবসন্ন, ক্লান্ত এবং শ্রান্ত চিত্ত তৃষ্ণার্ত্ত হয়ে সেই শান্তিবারি কামনা কর্ব্বে যা শুধু রবীন্দ্রনাথের বাণীর উৎসমুখে প্রবাহিত, সেটি হচ্ছে তাঁর মানবাত্মার একাত্মবাদ। একদা আর্য্যঋষি "আমরা অমৃতের পুত্র" এই বার্ত্তা শুনানের জন্য বিশ্ববাসীদের "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ" বলে যেমন ডেকেছিল তেমনি পৃথিবীর সেই দারুণ অবসাদের দিনে অজর, অমর রবীন্দ্রনাথও বিশ্বমানবকে মানবাত্মার একাত্মবাদ শোনাবেন। সেদিন জগতের প্রতি শিক্ষায়তনে, প্রতি নগরে, প্রতি জনপদে রবীন্দ্রনাথের কাব্য, তাঁর সাহিত্য, তাঁর দর্শন, তাঁর ইতিহাস, তাঁর শিক্ষা, তাঁর ভাষা, তাঁর ভাষাতত্ত্ব, তাঁর চিত্রকলা, তাঁর সঙ্গীত, মানুষের প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠ্‌বে।

কিন্তু এই আলোচনার মধ্যে একটি জিনিষ আছে—যা শুধু বাঙ্গালীর দ্বারাই সম্ভবপর,—সেটি হচ্ছে তাঁর স্বরূপ নির্ণয় করা। এই জিনিষটি বাঙ্গালী ভিন্ন আর কারো দ্বারা সম্ভবপর নয়। এই বাংলায় তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন, এই বাংলাতেই তিনি দেহরক্ষা করেছেন। এই বাংলার মাটী, বাংলার জল তাঁর দেহমনকে পুষ্ট করেছে। এই বাংলার মাটীতে মাথা ঠেকাতে তিনি বিশ্বমায়ের ও বিশ্বময়ীর আঁচলপাতা দেখেছিলেন। অর্থাৎ এখানেই একসঙ্গে তাঁর দেশাত্মবোধ ও বিশ্বাত্ম-বোধের দীক্ষা হয়েছিল এবং যেদিনটি তাঁর এই দীক্ষা হয় সেদিন জগতের পক্ষে পরম সুদিন বল্‌তে হবে। তখনই তিনি তাঁর অনাগত দিনের গুরুদায়িত্ব উপলব্ধি কর্ত্তে পেরে ( Nobel Prize পাবার অনেক আগে ) বলেছিলেন—

বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে কে মোর আত্মপর,<br>আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে কোথায় আমার ঘর।

একটি ঋক্‌মন্ত্রে ইন্দ্রদেবকে এই প্রার্থনা জানান হয়েছে "মানো অতিখ্য আগহি।" এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদের প্রথম ঐন্দ্র-সূক্তের প্রথম তৃচের শেষ লাইন। পূর্ব্বে ইন্দ্রদেবের বিভূতি উপলব্ধি করা হলো। তিনি আদিভূত দেব। তিনি গ্রহনক্ষত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি স্বর্গ, মর্ত্ত্য-অন্তরীক্ষ সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি বৃত্রের সংহার কর্ত্তা, তিনি মঘবান্, তিনি মানুষকে মোক্ষধন দান করেন। তিনি পরমদাতা। কিন্তু ইন্দ্রদেব সম্বন্ধে এই জ্ঞান, এই পরিচয় যথেষ্ট অনুমিত হলো না। তাই তৃচের পরিশেষে তাঁকে এই বলে প্রার্থনা জানান হলো "মানো অতিখ্য আগহি।" হে ইন্দ্রদেব, আমাদের অতিক্রম করে তোমার যেন কোন খ্যাতি না থাকে—অর্থাৎ তুমি এস, আগহি—এবং এসে আমাদের কাছে তোমার স্বরূপ প্রকাশ কর।

এই স্বরূপ জানাই সব জানার বড় জানা। সৃষ্টি থেকে সৃষ্টিকর্ত্তার, কীর্ত্তি থেকে কীর্ত্তিমান পুরুষের এবং কর্ম্ম থেকে কর্ত্তার একটা অস্তিত্ব আমরা অনুমান করে নেই। কিন্তু তাতে সম্যক পরিচয় সম্ভবপর নয়। তার ফলে না কর্ম্মকে, না কর্ত্তাকে আমাদের পক্ষে সবিশেষ জানা সম্ভবপর হয়।

কিন্তু এই স্বরূপের জ্ঞান সাধকের কিম্বা কবির অন্তর্দ্দৃষ্টি ছাড়া লাভ করা যায় না। তা ছাড়া সৃষ্টিতে সৃষ্টি কর্ত্তার কতটাই বা প্রকাশ হয়?—উপনিষৎ বলেন

পাদ অস্য বিশ্বভূতানি<br>ত্রিপাদ অস্য অমৃতংদিবি<br>পূর্ণস্য পূর্ণং আদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।

মানুষ যুগে যুগে তাজমহলের সৌন্দর্য্য দেখে বিমুগ্ধ হয়েছে। শুধু রবীন্দ্রনাথ কবির অন্তর্দ্দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেরেছিলেন সেই প্রশান্ত পাষাণের অন্তরালে বিরহী সম্রাটের অমর প্রাণ এবং তাই তিনি বলেছিলেন "তোমার কীর্ত্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ।" নগরীগণপ্রধানা বোগদাদ নগরী একদিন তার ঐশ্বর্য্যে, তার সৌন্দর্য্যে বিশ্বমানবকে বিমুগ্ধ করেছিল। আল্

মামুনের বোগদাদ তার এই ঐশ্বর্য্য, এই সৌন্দর্য্য পেয়েছিল খলিফা হরুণ-উল-রসীদের কাছে। শুধু Tennyson কবির অন্তর্দ্দৃষ্টি দিয়ে জেনেছিলেন যে বোগদাদের অতুল ঐশ্বর্য্য অতুল সৌন্দর্য্য তুচ্ছ তাঁর কাছে এই ঐশ্বর্য্য, এই সৌন্দর্য্য যাঁর পরিকল্পনা।

বৈদিক ঋষিদের প্রর্থনায় ইন্দ্রদেব তাঁদের কাছে এসে তাঁর স্বরূপ অনাবৃত করেছিলেন এবং অতীন্দ্রিয়দ্রষ্টা ঋষিরাও তা উপলব্ধি কর্ত্তে পেরেছিলেন, কিন্তু কবির স্বরূপ ধরা বড় কঠিন, কেননা কাব্যে তাঁর যে অভিব্যক্তি সেটি তাঁর তৎকালীন মনোভাবের অভিব্যক্তি, অর্থাৎ যখন যে ভাবের প্রেরণা তাঁর ভেতরে এসেছে এবং তাঁকে উদ্দীপিত করেছে তখন সেই ভাবটি ভাষাকারে রূপ পরিগ্রহ করেছে। সে মনোভাব কখনও এক এবং অভিন্ন হতে পারেনা, এবং অনেকস্থলেই তা পরস্পরবিরোধী আকার ধারণ করে। এইজন্য কোন কাব্যের কোন অংশ থেকেই একথা নিশ্চিতরূপে বলা চলে না যে এইটিই কবির মতবাদ। তবে সমগ্রের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট চিন্তাধারা লক্ষ্য করা যায়, যার সুস্পষ্ট আভাষ এবং ইঙ্গিত থেকে কবির স্বরূপের ধারণা করা চলে এবং তাতে পরস্পরবিরোধী ভাবগুলির একটি সমন্বয় ঘটে। কিন্তু এই ধারণা না কর্ত্তে পার্লে রবীন্দ্রনাথের অনেক লেখাই আজ আমাদের কাছে দুর্ব্বোধ্য এবং হেঁয়ালী হয়ে থাক্‌বে—যাকে আমরা বলি mysticism অতীন্দ্রিয়তা। প্রকৃত পক্ষে mysticism ও rationalism এর মধ্যে দর্শকের বিভিন্নস্তরের দৃষ্টিকেন্দ্রের পার্থক্য ব্যতীত আর কোনও পার্থক্য নাই। এক স্তরে যা দুর্ব্বোধ্য একটু উচ্চস্তরেই তা সহজ ও সরল।

প্রাচীন বয়সে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

এই গীতিপথপ্রান্তে, হে মানব, তোমার মন্দিরে<br>
দিনান্তে এসেছি আমি,—নিশীথের নৈঃশব্দ্যের তীরে<br>
আরতির সান্ধ্যক্ষণে। একের চরণে রাখিলাম<br>
বিচিত্রের নর্ম্ম বাঁশী,—এই মোর রহিল প্রণাম।

এই চারটী লাইন অনুধ্যান কর্লে হয়ত রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ অনেকটা উপলব্ধি করা যায় এবং তাঁর লেখায় যা দুর্ব্বোধ্য ও হেঁয়ালী তা যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ পরিগ্রহ করে। তাই আমি এই লাইন চারটী আলোচনা কর্ত্তে চাই।

অবশ্য এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে তাঁর জীবনের চরম এবং পরম উৎকর্ষ গীতিপথ-প্রান্তেই ঘটেছিল এবং সেই পথপ্রান্তেই তিনি তাঁর জীবনের ইষ্টদেবকে লাভ করেছিলেন। এবং সে ইষ্টদেব যে মানবের মন্দিরের ভেতরে সে কথা তিনি স্পষ্টাক্ষরে এবং মুক্তকণ্ঠে বলে গিয়েছেন। যেদিন জগতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত তাঁর যশোধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত সেদিনেও এই বাংলার দীনাতিদীনকে আহ্বান করে তিনি বলেছিলেন—

মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক্<br>
আমি তোমাদেরই লোক।

এই—হোক মোর শেষ পরিচয়,
আর কিছু নয়।

গীতিপথপ্রান্তে তিনি যে উৎকর্ষ লাভ করেছিলেন তার তুলনা নাই। রসসৃষ্টির বিশালতায়, গভীরতায় এবং মাধুর্য্যে তাঁর গীতিকাব্য শুধু ভবভূতির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়

নোৎপৎস্যতে মমকোঽপি সমান ধর্ম্মা
কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ বিপুলাচ পৃথ্বী।

কিন্তু কি অবস্থায় উপনীত হয়ে একের চরণে তিনি তাঁর বিচিত্রের নর্ম্মবাঁশী রেখে প্রণাম জানিয়েছিলেন সেইটিই জিজ্ঞাস্য।

প্রশ্নটি একটু ভাল করে বোঝা দরকার। আলঙ্কারিকেরা বলেন কাব্য রসাত্মক বাক্য—'কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং' এবং কাব্য প্রসঙ্গে তাঁরা নয়টি রসের অবতারণা করেন। কিন্তু তাঁদের আদি থেকে নবম রসের মধ্যে ভগবৎপ্রেমের কোন স্থান নাই। তাঁদের কবি রূপ, রস, গন্ধ স্পর্শের উপাদানে ভাষা এবং শব্দের সাহায্যে ইন্দ্রজালময়ী, বর্ণময়ী, বৈচিত্র্যময়ী রসসৃষ্টি করেন। বৈচিত্র্য, বহুত্ব এবং নানাত্বই হচ্ছে তাঁদের কবির প্রাণ। অবশ্য তাঁদের কবির রসসৃষ্টি জগতের কোন প্রাতিভাসিক বা ব্যবহারিক সত্য হতে কম সত্য নয়। প্রকৃতির গোপনতম রহস্য বর্ণের তুলিকায় তাঁদের কবি মানুষের সামনে এঁকে ধরেন। কিন্তু এইখানে তত্ত্বদর্শীদের সঙ্গে তাঁদের কবির একটু বিরোধ ঘটে। তত্ত্বদর্শী বহু হ'তে, নানা হ'তে, বৈচিত্র্য হ'তে এক এবং একত্বের সন্ধান দেন। তিনি রূপ থেকে রূপাতীত এবং অরূপে, রস থেকে নিত্যরসে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য থেকে অতীন্দ্রিয়ে, ভাষা থেকে মৌনে ও ভাষাতীতে এবং বাক্য ও মনের গোচর থেকে অবাঙ্‌মনসোগোচরে নিয়ে যান। শুধু তাই নয়। তিনি বলেন যতক্ষণ তোমার নানাত্ববোধ লোপ না পেল ততক্ষণ তোমার মৃত্যু অনিবার্য্য।

মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি। আবার উপনিষৎ বলেন ব্রহ্মই কবি—কবির্মণীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ।— উপনিষদের কবি শব্দের নিয়ন্তা ( কুনাতি শব্দায়তে ) এবং মনের নিয়ন্তা।

বেদ বলেন কবি সবিতা, জ্ঞানরশ্মি, জ্ঞানাধার, জ্ঞানময় এবং কে কোন যজ্ঞের অধিকারী কবির তা জানা ছিল বলে তাঁকে প্রথম আগ্নেয় সূক্তে বলা হয়েছে কবিক্রতুঃ। ( মহর্ষি যাস্ক তাঁর নিরুক্তগ্রন্থে অবশ্য কবিকে মনস্বী ও মেধাবী বলেছেন )। এথেকে' অথাতো কাব্যজিজ্ঞাসা অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় পৌঁছে যায়।

তাই জিজ্ঞাস্য এই, কি অবস্থায় উপনীত হলে কবির পক্ষে তাঁর বিচিত্রের নর্ম্মবাঁশী একের চরণে রাখা সম্ভবপর হয়?

কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আর একটি বিষয় চিন্তা করা দরকার। আজ রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রের নর্ম্মবাঁশী নীরব হয়েছে। আজ বংশী ও বংশীবাদক উভয়েই নীরব।

রবীন্দ্রনাথের ভেতরে যা কিছু জরামরণশীল ছিল আজ তা লুপ্ত হয়েছে। সুতরাং আজ এই কথাই জিজ্ঞাস্য যে এই নীরবতাতেই কি এদের পরিসমাপ্তি ?

উপনিষদ্ বলেন 'প্রাণো বিরাট্ প্রাণো মৃত্যুঃ।' রবীন্দ্রনাথ বলেন—অনিঃশেষ প্রাণ, অনিঃশেষ মরণের স্রোতে ভাসমান। এবং তিনি মৃত্যুকে লক্ষ্য করে বলেন,

দারুণ-ভাঙ্গন্ এযে পূর্ণেরি আদেশে
কী অপূর্ব্ব সৃষ্টি তার দেখা দিবে শেষে।

তাই জান্‌তে হয় কোথা থেকে সেই প্রাণন শক্তি আসে যা মৃত্যুর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে থাকে। এই বোঝাবার জন্য উপনিষৎ দুটি উপাখ্যানের অবতারণা করেছেন। মহর্ষি উদ্দালক আরণির পুত্র শ্বেতকেতু দ্বাদশবর্ষ ব্রহ্মচর্য্য পালন করে এবং বেদাধ্যয়ন করে যখন বাড়ী ফিরে এলেন তখন রাজর্ষি জনকের নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য আরণি শ্বেতকেতুকে পাঠালেন। শ্বেতকেতুকে রাজর্ষি জিজ্ঞাসা কর্ল্লেন, তুমি পরলোকতত্ত্ব কিছু জান্‌তে পেরেছ কিনা। শ্বেতকেতু এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পার্ল্লেন না এবং বাড়ী ফিরে মহর্ষিকে একথা বল্‌লেন। ছেলের মুখে এই কথা শুনে সেই ত্রিকালজ্ঞ ও ত্রিলোকজ্ঞ মহর্ষি বল্‌লেন, 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবা দ্বিতীয়ম্, তত্ত্বমসি।' মহর্ষির এই মহাবাক্যে অবশ্য শ্বেতকেতুর ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছিল এবং রাজর্ষির প্রশ্নেরও যথাযথ উত্তর পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী ঋষিগণ এইটেই যথেষ্ট মনে করেন নাই। তাই মহর্ষি সনৎকুমার ভার্গবীবিদ্যা নামে ভৃগুমুনির ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপাখ্যানের প্রচার করেন। তাতে ব্রহ্মের এই স্বরূপ নির্ণয় হয় যে বাক্য ও মন দিয়ে তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি হয় না, শুধু তিনি আনন্দময় এই পর্য্যন্ত জান্‌লেই জীবের আর কোন ভয়ের কারণ নাই।

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন ॥

তবে যা কিছু পরিদৃশ্যমান (যৎ কিঞ্চিৎ জগত্যাং জগৎ) এ সমস্তই তাঁর থেকে হয়েছে, তাঁতেই আশ্রয় করে আছে এবং প্রলয়কালে তাঁতেই পুন প্রবেশ করে। এই ব্রহ্ম।

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি
যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তিতৎ বিজিজ্ঞাসস্ব তৎ ব্রহ্ম ॥

সেই এক এবং অদ্বিতীয় সৎ ব্রহ্ম নিজের আনন্দে বিশ্ব সৃষ্টি করেন।

স ঐক্ষত সোঽকাময়ত প্রজায়েয় ইতি। একোঽহং বহুধাস্যাম্। স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যৎ কিঞ্চিদিদং সর্ব্বং।

কিন্তু এই আনন্দের সৃষ্টি রক্ষার জন্য তিনি যে ব্যবস্থাটি কর্‌লেন তাতে সৃষ্টির অভিনবত্ব বজায় রাখ্‌বার জন্য তিনি মৃত্যুকেও আদেশ দিলেন। ফলে বায়ু, সূর্য্য, অগ্নি ও ইন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুও লেগে থেকে কাজ কর্ত্তে থাক্‌লেন—

ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ
ভীষাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥

তবে এই রহস্য জান্‌তে হলে ধাম্নাস্বেন নিরস্ত কুহকং হতে হবে অর্থাৎ আত্মার তেজে মায়াজাল বিদীর্ণ কর্ত্তে হবে। এই মায়াজাল বিদীর্ণ করবার যে চেষ্টা সেই হচ্ছে আর্য্য ঋষিদের ব্রহ্মবিদ্যা বা পরাবিদ্যা অথবা বিদ্যা। এ বাদে আর সমস্তই অবিদ্যা। এবং তারা বল্লেন "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।" সুতরাং অমৃততত্ত্বের দিক্ দিয়ে আমাদের বুঝতে হয় যে জরামরণশীল রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর সঙ্গে তাঁর বাঁশী নীরব হয় নাই এবং তিনিও নীরব হন নাই। তাঁর বিরাট অবদান চিরকাল আমাদের উদ্দীপনা দিতে থাক্‌বে,—শরীরং ক্ষণ বিধ্বংসি, কল্পান্তস্থায়িনো গুণাঃ।

এখন আমরা আমাদের প্রথম প্রশ্নের দিকে ফিরে যেতে পারি। তাঁর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়েছিল বলেই তিনি রূপ থেকে অরূপের, ভাষা থেকে ভাষাতীতের, বহু ও বৈচিত্র্য থেকে এক ও একত্বের উপলব্ধি কর্ত্তে পেরেছিলেন।

শ্রুতি বলেন

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্‌দৃষ্টে পরাবরে॥

তিনি তাঁর জীবনের কর্ম্মসন্ন্যাস কর্ত্তে পেরেছিলেন তাঁর এই ব্রহ্মজ্ঞানের বলেই। তাই তিনি তাঁর বিচিত্রের নর্ম্মবাঁশীটিকে একের চরণে রাখ্‌তে পেরেছিলেন এই অবস্থায় হোতা ও হবনীয়ের পার্থক্য থাকে না। কস্মৈদেবায় হবিষা বিধেম? তেম্‌নি রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন

কার পানে পাঠাইবে স্তুতি
ব্যগ্র এই মনের আকূতি
অমূল্যেরে মূল্য দিতে ফিরে সে খুঁজিয়া বাণীরূপে।
হয়ে থাকে চুপ্; ছন্দ যায় থামি,
বলে আমি আনন্দিত, ধন্য আমি॥

এবং শরৎকালীন মধ্যাহ্ন আকাশের পানে চেয়ে বলেছিলেন

বৈদিক মন্ত্রের বাণী কণ্ঠে যদি থাকিত আমার
মিলিত আমার স্তব স্বচ্ছ ওই আলোকে আলোকে,
ভাষা নাই, ভাষা নাই,
শুধু দিগন্তের পানে চেয়ে
মৌন মোর মেলিয়াছে পাণ্ডুনীল মধ্যাহ্ন আকাশে।

আর বলেছিলেন,

চলিতেছে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি প্রাণী,
এই শুধু জানি,
চলিতে চলিতে থামে, পণ্য তার দিয়ে যায় কাকে,

পশ্চাতে যে রহে নিতে ক্ষণপরে সেও নাহি থাকে,
চলমান্ রূপহীন যে বিরাট্, সেই মহাক্ষণে আছে,
তবু ক্ষণে ক্ষণে নেই,
স্বরূপ যাহার থাকা আর না থাকা, খোলা আর ঢাকা,
কি নামে ডাকিব তাহে অস্তিত্ব প্রবাহে,
মোর নামে দেখা দিয়ে মিলে যাবে যাহে ॥

তাই মনে হয় এ চারটী লাইন অনুধ্যান কল্লেই আমরা তাঁকে তাঁর সমগ্রতায়, অখণ্ডতায় এবং পরিপূর্ণতায় পেতে পারি।

ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব সং।

আজ তিনি

আকৃষ্ণেণ রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ।
হরিণ্যয়েন সবিতা রথেণা দেবো যাতি
ভুবনামি পশ্যন্।

জীবনেরে কে রাখিতে পারে ?
তার নিমন্ত্রণ দিকে দিকে
নবনব পূর্ব্বাচলে আলোকে আলোকে

তাই যাবার আগে তিনি বল্‌তে পেরেছিলেন

স্পর্শ নিয়ে যাব ধরণীর
বলে যাব তোমার ধূলির
তিলক পরেছি ভালে।*

* ১৩৪৮ সালের ১৮ই মাঘ তারিখে রবীন্দ্র পূর্ণিমায় প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ

# অস্তমিত রবি

শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র চৌধুরী ( কবিশেখর )

উদয়—১২৬৮ বঙ্গাব্দ
বৈশাখ ২৫—সোমবার।

অস্ত—১৩৪৮ বঙ্গাব্দ, শ্রাবণ
২২—বৃহস্পতিবার দিবা ১২-১০ মিনিট
রাখিপূর্ণিমা।

শতাব্দীর স্বর্ণ আশা
প্রকৃতির স্নেহতাপে গলাইয়া
গড়েছিল ভারতীর ভাস্বর-তপন—
বাঙ্গালীর আপনার ধন
যে রবীন্দ্রনাথে,
আজি পথে,—
গত প্রাণ দেহটারে বাহি
অস্তাচল অভিমুখে
চলে তারি রথ,
ম্রিয়মান সমগ্র জগৎ ;
শুনি ওই কালের বিষাণ !
অমরের জয়রব ওঠে অমরায়
ডাকিয়া লইল বুঝি !—
আয় আয় আয়
আমাদের জ্যোতি শিখা
আয় ফিরে আয়
কার্য্য তোর হল অবসান।

আর প্রাণ ছড়াতে দিবনা—
নবীন প্রেরণা
ধরারে আবার নব বেশে
দিতে হবে আরও অনুভূতি।
আয়,—
ওই জীর্ণ পুরাতনে
আবার গড়িয়া দেই নূতন করিয়া।
যারে নিয়া
আরও নিত্য নবীন হয়,
যাহার পরশ
ভারতের অধ্যাত্ম জীবন
বিপুলা পৃথিবীরে
তুলিবে উজ্জ্বল করি।
তোরে দিয়া ওরে আবার গড়িব
অখণ্ড অধ্যাত্ম মহাধরা
যার পায়ে এক সংগে লুটিবে জগৎ
উদার মহৎ।
আয় ত্বরা—
অমরা ব্যাকুল আজি তোর অদর্শনে।
অমরার সেই টানে
তাই কি চলিয়া গেলে?
ভুলে
আপনারও আপনার ভূমি।
বলিয়াছ তুমি
"মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই"
সেই তুমি নাই।
কারে নিয়া মোরা বাঁচি বল!
তোমার প্রাণের বঙ্গভূমি—
যার মাটি যার জলে
যার বায়ু যার ফুলে ফলে
যার ঘরে যার হাটে বাটে

জোগাইয়া ভাষা
দিলে আশা—
পূর্ণ করিবার—সে সাধ—
ভুলিলে বল কোন্ মায়া টানে !
বাঙ্গালীর ভায়ে বোনে
যে রাখি বাঁধিলে—
সেই রাখি পূর্ণিমার দিনে
অফুরন্ত জোছনা সায়রে
কেন পাড়ি দিলে ?
রে নির্দ্দয়, কোন প্রাণে
বিদায় লইলে !
কাহারে কহিবে দেশ
তাহার এ দুঃখ দৈন্য ব্যথা।
দীর চিত্তে কে বল শুনিবে !
অভীমন্ত্রে কে দিবে উত্তর ?
পারিনা পারিনা আর
সহিবারে তোমার অভাব।
রহ ক্ষণ কাল রহ
আমরাও সংগী হই তব।
রবিজ্যোতি হারা দেশবাসী
এক সংগে সহ-যাত্রী হই
বারণ কোরনা।
আর যে পারিনা।
লইবে না।
রুদ্ধমান অসহায় আমরা রহিব
সহিতে কি অহরহ বেদনা কেবলি ?
মর্ম্মন্তুদ অশেষ যাতনা
জর্জ্জরিবে তুষবহ্নি সম
সহিতে পারিবে তুমি ?
অমরার আলোকে নাহিয়া
শান্তি সুখে পারিবে কি

রহিতে সেখানে ?
ভালো— !
ও আলো এতই যদি ভালো
তথা বাস কর
নাহি আর কোন অভিমান।
উদাস পরাণ—
ফেলিলাম মুছে আঁখিজল
বাঁধিলাম বজ্র দিয়ে বুক
কাঁদিয়া না অকল্যাণ করিব তোমার
মধু-মন্ত্র উচ্চারণ করি বারম্বার।
অমরার মহা মহোৎসবে
কর যোগ দান
আর না হইব মুহ্যমান।

---

বিগত ২৫শে শ্রাবণ রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ মন্দিরে অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ এম্., এ, বি, এল মহাশয়ের সভাপতিত্বে বিশ্বকবির শোক সভায় পঠিত।

# রবীন্দ্র প্রয়াণে

শ্রীপ্রবোধ কুমার মজুমদার এম্, এ, বি, এল।

রবীন্দ্রনাথ নাই। জগতের একটি আলোক আজ নির্ব্বাপিত। যে বিরাট পুরুষের জীবন জ্ঞানে, কর্ম্মে, শক্তিতে, সাধনায় সহস্রশিখায় জ্বলিতেছিল—যিনি বলিয়াছিলেন

"মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই"

মহাকালের অমোঘ নিয়মে তাঁহাকেও এ মরজগৎ হইতে বিদায় লইতে হইয়াছে।

কবি নিজেই একদিন বলিয়াছিলেন,

"জানি গো দিন যাবে, এদিন যাবে
একদা কোন বেলা শেষে
মলিন রবি করুণ হেসে
শেষ বিদায়ের চাওয়া আমার মুখের পানে চাবে।"

অবশেষে সত্যই সে দিন আসিল। ২২শে শ্রাবণ বেলা শেষে যে রবি অস্ত গেল সে বাঙ্গলার রবির মুখের পানে চাহিয়া, মলিন হাসি হাসিয়া শেষ বিদায় লইয়া গেল। আবার রাত্রি প্রভাত হইল। পশ্চিম গগনের মলিন রবি আবার নূতন দিনের তীরে দাঁড়াইয়া পূর্ব্বাচলের পার হইতে অরুণাভা বিস্তার করিল। কিন্তু আজ চারিদিক অন্ধকার – বাঙ্গলার রবি, ভারতের রবি, জগতের রবি চিরদিনের তরে অস্তমিত।

রবীন্দ্রনাথের মত মহামানবের তিরোধানে সমস্ত জগতেরই অপূরণীয় ক্ষতি। কিন্তু তিনি যে আমাদের বড় আপনার—আমাদের যে ক্ষতি হইল তাহার পরিমাপ কে করিবে? আমাদের সম্বল যে নিতান্তই কম—কিসের জোরে আমরা জগতের সভ্য সমাজে আসন দাবী করিব? এতদিন বিশ্বের দরবারে আমরা মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া বলিতে পারিয়াছি যে আমরা কাহারও চেয়ে হীন নই—আমাদের রবীন্দ্রনাথ আছেন। সর্ব্বকালের সর্ব্বদেশের শ্রেষ্ঠতম প্রতিভাশালী মনীষী যে আমাদেরই মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। একটি বিরাট জাতিকে যিনি নিজের মহিমাবলে আত্মমর্য্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাঁহার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশের ভাষা কোথায়!

আজ সেই দিন, যেদিনের কথা কল্পনা করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন,

"যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে

বাইব না মোর খেয়া তরী এই ঘাটে
চুকিয়ে দেব বেচা কেনা
মিটিয়ে দেব লেনা দেনা
বন্ধ হবে আনা গোনা এই হাটে।"

তাঁহার কল্পনার সোণার বাংলার সেই পাখী-ডাকা ছায়ায় ঢাকা পল্লীবাটে আর তো তাঁহার পায়ের চিহ্ন পড়িবে না। গ্রামের প্রান্তে কলনাদিনী স্রোতস্বিনীর স্নিগ্ধ ঘাটটিতে আর তাঁহার তরীখানি ভিড়িবে না। এ জগতের হাটে তাঁহার লেনা দেনা চিরদিনের মত বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তারপর ?

তার পর তিনি ঈষৎ অভিমানের ভাষায় বলিতেছেন,

"আমায় তখন নাই বা মনে রাখলে
তারার পানে চেয়ে চেয়ে, নইবা আমায় ডাকলে।"

অভিমান,—কিন্তু অভিযোগ নাই, জ্বালা নাই, আছে শুধু শিশুর প্রথম কলকাকলির ন্যায় মিষ্টতা। কোনদিন হয়তো আমাদের কোন অবহেলা তাঁহার মনে ব্যথা দিয়াছে, তাহারই এই সুমিষ্ট অভিব্যক্তি

"তখন আমায় নাই বা মনে রাখলে।"

তারপর তিনি বলিতেছেন

"তখন এমনি করেই বাজবে বাঁশি এই নাটে
কাটবে গো দিন যেমন আজো দিন কাটে।"

হায় কবি! এও কি কখনও সম্ভব। তেমন করিয়া আর কি কোনদিন বাঁশি বাজিবে ? অৰ্দ্ধশতাব্দীর অধিককাল যে বাঁশি বাজাইয়া তুমি বাংলার আকাশ বাতাস মাতাইয়া রাখিয়াছিলে। আবার কে বাজাইবে সেই বাঁশি ? কে শুনাইবে সেই আকুল করা তানে বিশ্বহৃদয়ের বিচিত্র মৰ্ম্মবাণী। মহাকালের এই নাট্যশালায় তুমি যে ভূমিকার অভিনয় করিয়া গেলে তাহার জন্য চিরদিন বিশ্বজগত তোমাকে স্মরণ করিবে। তুমি কি জানিতে না কবি যে কত মিথ্যা তোমার এই অভিমান

"আমায় তখন নাই বা মনে রাখলে।"

এই অভিমানের শেষ রেখাটুকুও যদি কবির মন হইতে আমরা মুছিয়া ফেলিতে না পারিয়া থাকি তবে আমাদের মত দুর্ভাগা আর কে ? কিন্তু মনে হয় বিদায়ের পূৰ্ব্বে তাঁহার মনে আর কোন অভিমান বুঝি ছিল না। শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত তাঁহার শেষ জন্মতিথি উৎসবে তিনি বলিয়াছিলেন যে তাঁহার দেশবাসীর নিকট হইতে তিনি যে প্রীতি ও স্নেহ পাইয়াছেন সেরূপ সৌভাগ্য খুব অল্প লোকেরই হয়।

তিনি জানিতেন যে মানুষের প্রীতি অপেক্ষা বড় কাম্য মানুষের আর কিছু নাই। মৃত্যুর পূৰ্ব্বে তাঁহার শেষ প্রকাশিত কবিতায় তিনি বলিয়াছিলেন

"মর্ত্ত্যের অন্তিম প্রীতিরসে
নিয়ে যাব জীবনের চরম প্রসাদ
নিয়ে যাব মানুষের শেষ আশীর্ব্বাদ।
*    *    *    *
প্রতিদানে যদি কিছু পাই
কিছু স্নেহ, কিছু ক্ষমা
তবে তাহা সঙ্গে নিয়ে যাই
পারের খেয়ায় যাব যবে
ভাষাহীন শেষের উৎসবে।"

বিশ্বমানবের প্রীতি—এই যে মর্ত্ত্যের অন্তিম প্রীতিরস—তাঁহার উপর এরূপ অজস্রধারায় বর্ষিত হইয়াছিল, যাহা আর কোন মানুষের জীবিতকালে হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুতে আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের দিকে দিকে যে হাহাকার উঠিয়াছে—জগতের শ্রেষ্ঠ কবি, মরমী, দার্শনিক ও মনীষীবৃন্দ তাঁহার উদ্দেশে যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছেন, তাহা জগতের ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব। কবি আজ মরজগতে নাই। কিন্তু সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের অমরগণের সহিত তাঁহার আসন চিরস্থায়ী হইয়া রহিল।

আমাদের অতিতুচ্ছ জীবনের একটি পরম গর্ব্বের বিষয় ছিল যে আমরা রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার একটি কবিতায় আক্ষেপোক্তি করিয়াছিলেন,

"আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে—"

আজি হইতে শত শত বৎসর পরে যাহারা রবীন্দ্রনাথের কাব্য পাঠ করিবে তাহারাও দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত বলিবে—

"আমি যদি জন্ম নিতেম রবীন্দ্রের কালে"

ইহা যে কত বড় গৌরব, আমাদের ক্ষুদ্র জীবনের যে ইহা কত বড় সম্পদ, অনায়াসলব্ধ বলিয়াই বোধ হয় আমরা তাহার যথার্থ মূল্য বুঝিতে পারি নাই। হায়, আমাদের সেই গৌরবের আজ অবসান।

জ্ঞানের উন্মেষ হইতে যাঁহার বাণী অন্তরের অন্তঃস্থলে স্থান পাইয়াছে, যাঁহাকে চিরদিন পরমাত্মীয় বলিয়া অনুভব করিয়াছি, তিনি আজ চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার উপযুক্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানের ভাষা কোথায় পাইব। এ শুধু শোকাভিভূত হৃদয় হইতে উৎসারিত একবিন্দু অশ্রুজল।

---

রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণে রঙ্গপুরে অনুষ্ঠিত জনসাধারণের শোক সভায় পঠিত

# রবীন্দ্র প্রয়াণে

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিদ্যাবিনোদ

শতাব্দীর দীপ্ত রবি অস্তাচলে ডুবে গেল হায়—
মগ্ন বিশ্ব বিয়োগ ব্যথায় !
বহুমুখী প্রতিভার হেন অভ্যুদয়
এযে এক পরম বিস্ময় !
কোন যুগে কোন কালে জগতে কখন
হয় নাই হেন সংঘটন !
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবের এ মহা প্রয়াণে
জনগণ প্রাণে
শোকের ঝটিকা আজ বহে খরতর !
স্তম্ভিত প্রকৃতিরাণী—বিশ্ববাসী বেদনা কাতর !
মহা কবি ! বীণা তব হয়েছে নীরব !
রচনার ইন্দ্রজাল—মনোহর ভাষার বৈভব,
কাব্যের অপূর্ব্ব সৃষ্টি, অজানার বৈজয়ন্তী-গীতি,
—কে জোগাবে নিতি নিতি
কল্প-লোক হ'তে তাহা অবিশ্রান্ত করি, আহরণ ?
বিশ্বকবি তোমার মরণ !
হে বরেণ্য—কবিগুরু !
তুমি যত গেয়ে গেলে গান,
চিরদিন রহিবে অম্লান ।
বাণী তব মহান্ উদার
করিবে মানব চিত্তে সীমাহীন শক্তির সঞ্চার !
অফুরান সৌন্দর্য্যের অনন্ত আকর
কীর্ত্তি তব অক্ষয় অমর !

অমানুষী শক্তি তব
অতুল অনন্ত-গর্ভ—চির অভিনব !
যশের শিখরে তুমি লভিয়াছ স্থান
কীর্ত্তিস্তম্ভ—তব অবদান !
বনান্তে—নদীর তীরে, তরুর মর্ম্মরে,
বিহগের কলকণ্ঠস্বরে,
শ্রাবণ ধারায় আর বসন্তের রাতে,
শারদ প্রভাতে,
আকাশে
বাতাসে
ধ্বনিবে তোমার গান যুগ যুগান্তর,
পুলকে করিবে পূর্ণ মানব অন্তরঃ
ধন্য রবি—ধন্য কবিবর !
এ যুগের ভাবধারা তুমিই এনেছ কবি,
রচনার অন্তরালে চির সুন্দরের ছবি
ফুটায়েছ অপূর্ব্ব নবীন !
মানবের চিত্তে তাহা জাগাবে বিস্ময় চিরদিন !
মহাকবি ! অজেয় মৃত্যুরে তুমি করেছ পরাজয়
তাই সে তোমার শিরে তুলে দিল দীপ্তিময়
যশের মুকুট খানি—অক্ষয় অমর !
বিলুপ্ত হবেনা তাহা যতদিন আছে চরাচর !
রবি তুমি নহ শুধু ভারতের—তুমি যে বিশ্বের রবি ;
হে মহাসাধক, সৌম্য, জ্ঞান-দীপ্ত, গুণী মহাকবি
করি দেব ! জয় উচ্চারণ,
ভক্তের অশেষ শ্রদ্ধা করহ গ্রহণ !

# "৺রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণে"

( জনসভায় প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ )

অধ্যাপক শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্, এ ( ডবল্ )

বাংলার রবীন্দ্রনাথ—ভারতের রবীন্দ্রনাথ—বিশ্বপ্রেমিক জগদ্বরেণ্য কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ আর ইহজগতে নাই। সমগ্রদেশ আজ তাঁর শোকে আচ্ছন্ন। মাত্র কয়দিন পূর্ব্বে তাঁর ৮১ তম জন্মতিথি উৎসব সম্পন্ন হয়েছে; কে জান্‌তো এ কয় দিনের মধ্যেই মৃত্যুর আহ্বান তাঁর নিকট এসে পৌছাবে—তাঁর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করবার জন্য আমরা এখানে এভাবে সমবেত হব!

দীর্ঘ ৮১ বৎসর জীবিত থেকে, এবং জীবিতাবস্থায়ই নিজেকে যশের সর্ব্বোচ্চ আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখে তিনি মহাপ্রয়াণ করেছেন বটে, তথাপি আজ তাঁর গুণাবলীর কথা স্মরণ ক'রে এবং তাঁর অভাবে আমাদের অসহায় অবস্থার কথা মনে ক'রে ব্যথিত হচ্ছি; বাঙ্গালীগত প্রাণ রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা, তেজস্বিতা, নির্ভীকতা, বিশ্বমানবতা প্রভৃতি গুণাবলী আজ যুগপৎ আমাদের মনোমধ্যে উদিত হচ্ছে।

শোকাভিভূত সমবেত ভদ্রমণ্ডলী! আমাদের রবীন্দ্রনাথ যে শুধু জগতের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন, তা নয়; তাঁর প্রতিভা ছিল সর্ব্বতোমুখী। কি গীতি কাব্য, কি নাটক, কি উপন্যাস, কি প্রবন্ধ, কি সমালোচনা—সকল বিষয়েই রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ প্রতিভা দেখিয়ে গেছেন—বাংলা ভাষার সম্পদ্ আর বাঙ্গালীর গৌরব বাড়িয়ে গিয়েছেন। কবি গেয়েছিলেন—

"জগৎ-কবি-সভায় মোরা তোমার করি গর্ব্ব,
বাঙালী আজ গানের রাজা, বাঙালী নহে খর্ব্ব।"

বাস্তবিক, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বাঙ্গালীর গৌরব—রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আমাদের সম্পদ; এবং এখনও—মরণের বশ হলেও—তিনি আমাদের অক্ষয় সম্পদ্ এবং গৌরব হয়েই থাক্‌বেন।

রবীন্দ্রনাথ নাই। আজ তাঁর অক্ষয় কীর্ত্তি "বিশ্বভারতীর" জন্য—সর্ব্বদেশের সর্ব্বজাতির মনীষিগণের মিলনকেন্দ্রের জন্য—সার্ব্বজনীন সভ্যতা ও শিক্ষার কেন্দ্র "বিশ্বভারতীর" জন্য আমরা উদ্বিগ্ন। দেশবাসী "বিশ্বভারতী"কে বাঁচিয়ে রাখুন—এই প্রার্থনা।

ভদ্রমহোদয়গণ! আপনারা জানেন, কবি হলেও—সাহিত্যিক হলেও, রবীন্দ্রনাথ নিজেকে শুধু সাহিত্যের আবেষ্টনীর মধ্যেই চিরকাল বদ্ধ রাখতে পারেন নি। তাঁর দৃষ্টি যখন

প্রসারিত হলো বাইরে, তখন দেশের দুরবস্থা দেখে তিনি স্তম্ভিত হলেন—এই হতভাগ্য জাতির পরিণাম ভেবে তিনি আকুল হলেন। নিতান্ত অভিভূত হয়ে কবি বলেছিলেন—

"এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা,
এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা,
ডাকিয়া বলিতে হবে—
মুহূর্ত্ত তুলিয়া শির
একত্র দাঁড়াও দেখি সবে।"

যখনই এই হতভাগ্য জাতির উপর দিয়ে সবলের অত্যাচার অবিচার চলেছে, তখনই রবীন্দ্রনাথ তেজোদৃপ্ত ভাষায় তা'র প্রতিবাদ করেছেন, তাঁ'র প্রতিকার করবার চেষ্টা করেছেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তাঁর নির্ভীক্ উক্তি আর কার্য্যাবলীর কথা কার না স্মৃতিপথে আজ উদিত হচ্ছে! স্বদেশী আন্দোলনের সময় জাতির পুরোভাগে দাঁড়িয়ে তিনি তা'কে যেভাবে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলেছিলেন, সে কথা আজ কে না মনে করছেন! আর মৃত্যুর কয় মাস পূর্ব্বে "মিস্ র‍্যাথ্‌বোনের" উক্তির যে প্রতিবাদ তিনি করেছিলেন—ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী সম্বন্ধে উক্ত মহিলার সদম্ভ উক্তির যে যোগ্য প্রত্যুত্তর তিনি স্বীয় জ্বালাময়ী ভাষায় দিয়েছিলেন, তা আজও কার না হৃদয় অধিকার করে আছে! ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস যখন লিখিত হবে, তখন সেখানেও তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে থাক্‌বে। আজ এই দুর্দ্দিনে—জাতির এই মহাসঙ্কটের দিনে রবীন্দ্রনাথের তিরোধান আমাদের ব্যথিত বিহ্বল ক'রে তুলেছে।

ভারতের অগণিত অসহায় নরনারীর জন্য কবির প্রাণ কিভাবে কাঁদত, তা আপনারা জানেন। ভারতের শিক্ষা, দীক্ষা, অন্নবস্ত্র, স্বাস্থ্য প্রভৃতির শোকাবহ অবস্থা কবি কোনদিনই ভুলতে পারেন নি। এই সেদিনও তিনি বলেছিলেন—"মানুষের শরীর ও মনের যা কিছু অত্যাবশ্যক, তা'র এমন নিরতিশয় অভাব বোধ হয় পৃথিবীর আধুনিক শাসনচালিত কোন দেশেই ঘটেনি। অথচ এই দেশ ইংরেজকে দীর্ঘকাল ধরে তা'র ঐশ্বর্য্য জুগিয়ে আসছে।"

ধর্ম্মের ধুয়া তুলে একদল স্বার্থান্ধ নেতৃত্বকামী লোক যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ দেশময় ছড়িয়ে দিয়েছেন, সে সম্বন্ধে অনেকেই আমাদের সমাজব্যবস্থার দোষ দিয়ে থাকেন; কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের কবি কি বলেছিলেন দেখুন—"এই দুর্গতির রূপ যে প্রত্যহই ক্রমশঃ উৎকট হয়ে উঠেছে সে যদি ভারত-শাসন-যন্ত্রের উর্দ্ধস্তরে কোন এক গোপন কেন্দ্রে প্রশ্রয়ের দ্বারা পোষিত না হতো, তা হ'লে কখনই ভারত-ইতিহাসের এত বড়ো অপমানকর অসভ্য পরিণাম ঘটতে পারতো না।" ভারতের এই অপরিসীম দুর্গতি, অবর্ণনীয় অসহায় অবস্থা কবিপ্রাণে কি

দারুণ আঘাত করেছিল, তা তাঁর সে দিনের কথায় বুঝ্‌তে পেরেছেন—বেঁচে থাকাটা তাঁর কাছে "বেয়াদপি" এবং "অসহনীয়" হয়ে উঠেছিল।

শুধু ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র বিশ্বের মানবের জন্য তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠেছিল। বিশ্বব্যাপী এই মহাপ্রলয়ের মধ্যে বিশ্বমানবের কাতর আর্ত্তনাদ কবিচিত্তকে উদ্বেলিত ক'রে তুলেছিল।—"মানব-পীড়নের মহামারী পাশ্চাত্য সভ্যতার মজ্জার ভিতর থেকে জাগ্রত হয়ে উঠে আজ মানবাত্মার অপমানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত বাতাস কলুষিত করে দিয়েছে।" বিশ্বমানবের উপর এই জঘন্য অত্যাচারের বিষয় রবীন্দ্রনাথ ভাষায় রূপ দিতে গিয়ে অঁাতকে উঠেছেন—

"সভ্য শিকারীর দল পোষমানা
শ্বাপদের মতো,
দেশ বিদেশের মাংস করেছে বিক্ষত,
লোলজিহ্বা সেই কুক্কুরের দল,
অন্ধ হ'য়ে ছিঁড়িল শৃঙ্খল,
ভুলে আত্মপর,
আদিম বন্যতা তাঁর উদ্ঘারিয়া উদ্দাম নখর
পুরাতন ঐতিহ্যের পাতাগুলা
ছিন্ন করে
ফেলে তার অক্ষরে অক্ষরে
পঙ্কলিপ্ত চিহ্নের বিকার।"

আপনারা জানেন, জাপানের উন্নতিতে কবি কতই না আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন—তা'র সমৃদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। কিন্তু জাপানের নৃশংস অভিযানকে তিনি কিছুতেই ক্ষমা কর্‌তে পারেন নি। জাপানের সুপ্রসিদ্ধ কবি ইয়ানো নোগুচি যেদিন "Asia for Asiatics" এবং মানবতাকে রক্ষা করাই জাপানের উদ্দেশ্য বলে' ঘোষণা করেছিলেন, সে দিন তিনি নোগুচিকে বিশেষভাবেই সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু, তারপর সেই নোগুচিই যেদিন জাপানের চীন অভিযান সমর্থন করবার জন্য তাঁ'কে লিখ্‌লেন, সে দিন আমাদের কবি কি তীব্র ভাষাই না তাঁ'কে তিরস্কার করেছিলেন। বিশ্বমানবকে মনুষ্যত্বের অধিকার থেকে যারা বঞ্চিত করেছে, তাদের তিনি কখনও ক্ষমা কর্ত্তে পারেন নি।

মনুষ্যত্বের জয় যে একদিন না একদিন অবশ্যই হবে, সে বিষয়ে আমাদের কবি নিঃসংশয় ছিলেন। তাই মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি নিজ দেশবাসীকে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববাসীকে এই বাণী শুনিয়ে গেছেন—"আশা করবো মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্ম্মল আত্মপ্রকাশ, হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্ব্বাচলের সূর্য্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর

একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম ক'রে অগ্রসর হ'বে তা'র মহৎ মর্য্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম ব'লে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।"

বিশ্বমানবের দরদী বন্ধু বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণে আজ শুধু এদেশবাসী নয়, সমগ্র বিশ্বের লোক শোক প্রকাশ কচ্ছি।

আসুন, আমরা সকলে দণ্ডায়মান হয়ে বিশ্বকবির স্বর্গত আত্মার মঙ্গলের জন্য পরম পিতা পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি।

ওঁ শান্তিঃ।

## শোকোচ্ছ্বাস।

( পণ্ডিত শ্রীনিবারণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কবিভূষণ )

ভারত-গৌরব-রবি শ্রীরবীন্দ্রনাথ,
কাব্য কাননের চির সুকণ্ঠ কোকিল ;
ভারতীর বরপুত্র সেবক সাক্ষাৎ,
হৃদয় প্রশস্ত অতি—শুদ্ধ অনাবিল।
দীনা ক্ষীণা পরাধীনা জন্মভূমি মা'র ;
তব তিরোধানে মুখ হ'ল অন্ধকার।

কল্পনার সহযোগে নিত্য নবভাবে,
গাঁথিয়ে ভাষার মালা বাণীর মন্দির ;
হে শ্রেষ্ঠ পুজারি ! বল কে আর সাজাবে ?
কেবা হেন একনিষ্ঠ সেবক সুধীর।
ভুবন পরাস্ত করি—জয়মাল্য আর ;
কে আনিয়া দোলাইবে গলদেশে তাঁর ?

তব সম কেবা আর করিয়ে যতন,
গাহিবে বাণীর স্তোত্র সঙ্গীতের সুরে ;
কে "বিশ্বভারতী" হেন করিয়ে স্থাপন,
উন্মুক্ত রাখিবে দ্বার জগতের তরে ?
জ্ঞানে—গুরু বৃহস্পতি, গুণে—যুধিষ্ঠি
সংসার সংগ্রামে শ্রেষ্ঠ ভীষ্ম সম বীর।

৪

বাণীর সেবক যাঁরা—তাঁহারা সকলে,
সহে নিত্য কমলার সপত্নী বিদ্বেষ ;
সে প্রথা ক'রেছ দূর প্রতিভার বলে,
তব প্রতি উভয়ের করুণা অশেষ।
সে করুণা একা দেব না করি গ্রহণ ;
জগতেরে করিয়াছ অংশ বিতরণ।

৫

ঠাকুর বংশের তুমি প্রেমের ঠাকুর,
অভাগিনী বঙ্গমা'র সুকৃতি সন্তান ;
শত যত্নে দুঃখ তাঁর করিবারে দূর,
দেশাত্মবোধক কত গাহিয়াছ গান।
একতানে সকলের হৃদয়ের তার ;
বাঁধিতে ক'রেছ দেব যত্ন বারে বার।

৬

প্রজার শাসন তরে জালিওয়ানা বাগে,
জ্বলেছিল যে বিভৎস ক্রোধ হুতাশন ;
প্রতিবাদ তরে তার সকলের আগে,
"নাইট উপাধি" দেব করিলে বর্জ্জন।
স্বদেশের দুঃখ দৈন্যে দ্রব ছিল প্রাণ ;
সযত্নে সাধিলে কত তাঁহার কল্যাণ।

৭

কাব্যাকাশে ছিলে তুমি পূর্ণ শশধর,
সহস্র খদ্যোত্ মাঝে সম্রাটের বেশে ;
অফুরন্ত ভাষা তব সরস সুন্দর,
লিখিলে অসংখ্য গ্রন্থ বসি বঙ্গদেশে।
বিশ্বের বরেণ্য তুমি মহামান্য কবি ;
আঁকিয়া গিয়াছ কত নব নব ছবি।

৮

দিবসের দ্বিপ্রহরে—দিনে দ্বাবিংশতি-
শ্রাবণের—তেরশত আটচল্লিশ সালে ;
গুরুবার কৃষ্ণপক্ষ প্রতিপদ তিথি,
কৃষ্ণের হিন্দোল যাত্রা অবসানকালে।
মহাযাত্রা করি কবি স্বর্গে গেল চ'লে ;
ভাসাইয়া সকলেরে নয়নের জলে।

৯

হে আচার্য্য ! শতমুখী প্রতিভা তোমার,
ক্ষুদ্র আমি—সাধ্য নাই করি তা' প্রকাশ ;
হইল যে অপচয় জন্মভূমি মা'র,
তাহা আর হবে পূর্ণ নাহি সে বিশ্বাস।
বাঙ্গালীর গর্ব্ব তুমি—ভারত গৌরব ;
তব তিরোধানে তাই ম্রিয়মাণ সব।

১০

যাও তবে স্বর্গে কবি হিরণ্ময় রথে,
তাপ-তপ্ত ধরণীতে থাকিয়া কি ফল ;
কবিগণ তব তরে দাঁড়াইয়া পথে,
অভ্যর্থনা লাগি আছে দেবতা সকল।
কীর্ত্তিবলে ইহলোকে হইলে অমর ;
স্বরগের শান্তি ভোগ কর অতঃপর।

---

জগদ্বরেণ্য মহাকবি রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণে রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে ২৭শে শ্রাবণ, ১৩৪৮ তারিখের সাধারণ সভায় পঠিত।

# রবীন্দ্র তিরোধানে

শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র চৌধুরী (কবিশেখর)

আবির্ভাব
১২৬৮—বৈশাখ ২৫ সোমবার

তিরোধান
১৩৪৮—শ্রাবণ ২২। বৃহস্পতিবার
রাখি পূর্ণিমা দিবা ১২-১০ মিনিট।

যে কথা ভাবিনি বলি সেই কথা
যে ব্যথা বুঝিনা জাগে সেই ব্যথা
জানিনা এসেছি কাহার বারতা
কারে শুনাবার তরে।

অন্তর্য্যামী—চিত্রা।

বঙ্গভারতীর মন্দির দুয়ার যিনি ভাস্বর দীপালোকে আলোকোজ্জ্বল করিয়া আপনার সাধন বেদীতে দেবী বঙ্গভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন—কাব্যস্রক্‌চন্দনের উপায়ন উৎসর্গ করিয়া বন্দনায়—গানে তৃপ্ত করিয়াছিলেন—বাণীর আশীষ সভ্য জগতের দিকে দিকে বিচ্ছুরিত করিয়াছিলেন—স্তম্ভিত করিয়াছিলেন বহির্ভারতের সংস্কৃতিকে; সেই ভারতীর আদরের দুলাল—বাঙ্গালীর অতি আপনার নিকট জন কালের করাল কোলে আশ্রয় লইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের লৌকিক দেহান্ত হইয়াছে একথা বিশ্বাস করিলেই নিজকে অনেক ছোট—নিতান্ত কাঙ্গাল বলিয়া মনে হয়। তাঁহার এই পার্থিব পরিবর্ত্তন যখনই মনে হয়—যখনই মনে হয় তাঁহাকে আর সেইরূপে ফিরিয়া পাইবার উপায় নাই—তখনই হৃদয়ের ভাষা নয়নের পথে বাহিরিয়া আসে।

তাপস রবীন্দ্রনাথ যদিও

যে চেৎ পূর্ব ঋতসাতা ঋতজাতা ঋতাবৃধঃ।
ঋষীন্ তপস্বতো যম তপোজাঁ অপিগচ্ছতাৎ॥

পূর্ব তাপসগণের সাধনারই মত সিদ্ধ হইয়া অক্ষয়লোকে নবজন্ম লাভ করিয়াছেন—যদিও তিনি

সহস্রনীথাঃ কবয়ো যে গোপায়ন্তি সূর্য্যম্।
ঋষীন্ তপস্বতো যম তপোজাঁ অপি গচ্ছাৎ॥

বৈদিক স্তোত্র।

অপার দৃষ্টিসম্পন্ন কবিগণের অম্লান নৈকট্যলাভ করিয়াছেন—তপস্বী ঋষিগণের নিকট পরম তপস্বীর মত গমন করিয়াছেন—আনন্দ লোকের অধীশ্বর হইয়া পরমানন্দ লাভ করিতেছেন—তথাপি আমরা তাঁহাকে ভুলিতে পারি না তো।

রবীন্দ্রনাথ নাই কে বলে? যাঁহার সৃষ্টি আজ নিখিলের পঞ্চভূতে বিজড়িত তিনি যাইতে পারেন না। ভূমানন্দের বাসনায় পরম পুরুষের সাযুজ্যলাভ করিতে ছুটিলেও—আত্মহারা হইলেও প্রিয় প্রিয়তর দেশকে ভুলিয়া থাকিতে পারিবেন না—আমরা বিশ্বাস করি! অমৃত পিয়াসী আত্মা বায়ুভূত নিরাশ্রয়কে আশ্রয় লইয়া অমরার অফুরন্ত আলোকের ঝরণায় অবগাহন করিতে আপনার পার্থিব জীবদেহকে পৃথিবীর শব্দস্পর্শরূপ অনুভূতি সংবেদন ইত্যাদি উপলব্ধির উর্দ্ধে সঙ্কোচ শরীর লইয়া প্রয়াণ করিলেও ধরণীর একত্বের সাধনায় প্রসারমান অন্তর সীমার বন্ধনে দীপ্তিহীন নিষ্প্রভ না করিয়া অফুরন্তের অন্বেষণে অনন্ত যাত্রা নিলেও আমাদের মনে হয়!—

কখনো হৃদয়ে কখনো বাহিরে
কখনো আলোকে কখনো তিমিরে
কভুবা স্বপনে কভু সশরীরে
পরশ করিয়া যাবে।
অন্তর্য্যামি—চিত্রা।

তাই আনন্দের মত্ততায় অধীর হইয়া সাধের প্রিয় বাঙ্গালীকে শস্যশ্যামা লতাপত্র ঘেরা দীনা গুণ্ঠিতা বাংলাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিতে পারিবেন না।

চিরভূমানন্দের উপাসক মুকুলের পূর্ণ সুষমার আকাঙ্ক্ষার মত জীবনের অসম্পূর্ণ আপনাকে বর্ধিত পূর্ণ ও রেণু রেণু করিয়া বিলাইয়া—নানা আয়োজন অভিব্যক্তি ভেদ ছেদকে ঠেলিয়া অনন্ত অভিমুখীন একাগ্রযোগী অসীমকে বরণ করিতে ছুটিলেও—সীমা ও শান্তের অভ্যন্তরে আপনাকে সত্য করিয়া উপলব্ধি করিতে পলে পলে—স্বরূপের ব্যাকুলতায় অদম্য আগ্রহে অগ্রসর হইলেও—গোপন আকাঙ্ক্ষার সুরকে স্পষ্ট করিয়া, খণ্ড ও অল্পের মধ্যে যে আবর্তন চলিতেছিল তাহাকে সুন্দর ও সম্পূর্ণ করিয়া আপনার পথে প্রয়াণ লইলেও, আমরা জানি!—

প্রলয় সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা,
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।
উৎসব—আবর্তন।

তিনি যাইতে পারেন না। তাঁহার

এ সাত-মহলা ভবনে আমার
চির জনমের ভিটাতে,
স্থলে জলে আমি হাজার বাঁধনে
বাঁধায়ে গিঁঠাতে গিঁঠাতে।
উৎসর্গ—প্রবাসী।

এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর নানা ভবনে তিনিযে গিঁঠাতে গিঁঠাতে বাঁধা—যাইবার উপায় নাই।

তিনি যান নাই। যাইতে পারেন না। বাংলার মাটির মায়াটানে আকাশে বাতাসে তিনি অবিনশ্বর। মরণ বিজয়ী প্রাণ তাঁহার চিরজীবন্ত। তাঁহার মৃত্যু নাই—হইতে পারে না। যিনি 'গলায়ে গলায়ে বাসনার সোনা প্রতিদিন' রচনা করিয়াছেন তাঁহার অফুরন্ত বিকাশ প্রকাশ লইয়া রহিবে চিরদিন—চির অক্ষয় অব্যয় হইয়া। যাঁহার কথার অন্তর শতবর্ষ পরেও 'আমার বসন্ত গান তোমার বসন্ত দিনে ধ্বনিত হউক ক্ষণতরে'—(১৪০০ সাল) তিনি মরেন নাই—মরেন না—মরিতে পারেন না।

রবীন্দ্রনাথ নাই কে বলে! ভূমান্বেষী আনন্দময় বায়ুভূত নিরাশ্রয় নিরালম্ব সঙ্কোচ শরীরি! আমরা তোমাকে ছাড়িতে পারিব না। এই আঁখিনীর আর শ্রদ্ধাক্ষীর উৎসর্গ করিতেছি পুষ্ট হও—তৃপ্ত হও। আনন্দ যজ্ঞের নিমন্ত্রণের কোলাহলে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া তোমার কাঙ্গাল দেশবাসীকে উপেক্ষা করিও না। তাই অসহায় কাঙ্গালকণ্ঠে কহিতেছি

ওঁ মধুবাতা ঋতায়:তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মধ্বীর্ণ সন্তোষধীঃ। মধুনক্তম্ উতোষসো
মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধুমান্ নো বনস্পতি
মধু মাঁ অস্তু সূর্য্যঃ।

বায়ু, নদী, সিন্ধু, রবি, বনস্পতি, রাত্রি, উষা, পৃথিবী, ধূলি মধুমান্ হইয়া যুগ যুগান্তের প্রাণে মনে ও আত্মায় নব নব বিভূতিতে তোমাকে জাগ্রত রাখুক—তুমি শাশ্বত থাক।

এসো ভাই সব, বিশ্বের পুরোভাগে তাঁহার মধুময় জাগ্রত জীবন-বাণীকে স্থাপন করিয়া আমরা সম্মিলিত স্মৃতি রক্ষা করিবার জন্য জগতকে আহ্বান করি :—

এসহে আর্য্য এস অনার্য্য
হিন্দু মুসলমান
এস এসো আজ তুমি ইংরাজ
এস এস খৃষ্টান।
এস ব্রাহ্মণ শুচী করি মন
ধর হাত সবাকার

এসহে পতিত হোক্ অপনীত
সব অপমান ভার।
মার অভিষেকে এস এস ত্বরা
মংগলঘট হয়নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র করা
তীর্থনীরে
আজি ভারতের মহামানবের
সাগর তীরে।

ভারততীর্থ—গীতাঞ্জলী

**শান্তি**

শ্রাবণ ২৬ | ১৩৪৮ সোমবার তাজহাট রাজপ্রাসাদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষ এম, এ, বি, এল মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শোক সভায় পঠিত।

# কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের তিরোধানে

# শ্রদ্ধাঞ্জলি

শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র সেন।

( ১ )

ভেতো মৃত বাঙ্গালীর অমূল্য রতন
ধরা ছেড়ে আজ তুমি করিলে প্রয়াণ
কি বলিব শুধু আর
বেদনার অশ্রু ভার
কত কথা পড়ে মনে তোমার কথনে
চলে গেলে তুমি আজ ধরার পেছনে ॥

( ২ )

শত শত শ্রদ্ধাঞ্জলি তোমার পায়েতে
দিয়েছিল দিতেছিল সারা ধরণীতে
আমাদের কিছু নাই
কাঁদা টুকু খুঁজে পাই
আঁখি মুদে তাই থাকি তোমার ধ্যায়ানে
তোমার রূপের ছবি দেখি মনে মনে ॥

( ৩ )

শুধু মনে হয় কেন তুমি এসেছিলে
এ মরা বাঙ্গালায় আলোক জাগালে
সারা বিশ্ব দ্বারে দ্বারে
হানা দিয়ে আলোটারে
নিয়ে এলে পূজা দিতে বাণীর পায়েতে
মোরা শুধু দিশেহারা তোমার আলোতে ॥

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের তিরোধানে

( ৪ )

তোমারে করে ঘৃণা বেদনা দিয়ে কত
অঙ্কুরে মারিতে মোদের বিধান সে শত
কোনদিন তার তরে
মোদের অবজ্ঞা ভরে
যাওনি বলিয়া কিছু কথা কটু স্বরে ;
ভাবি তাই কত পিছে আছি মোরা পড়ে

( ৫ )

তুমি ছিলে স্থির সৃষ্টি এ ধরা দেবীর
ভেবে দেখি সোজা নও অতি বড় বীর
উঠিলে রবির মত
মেঘ কাটি কত শত
জগতে জানায়ে দিলে প্রভাব তোমার
মোরা যবে মাথা নীচু আছিনু সবার ॥

( ৬ )

কত শত কালিমাতে ভরে গেছে ধরা
তা দেখেই চলে গেলে দুঃখ মনে ভরা
শান্তি মনে অশান্তির
ঢেউ ভাঙ্গে স্থির নীর
অভিমানে চলে গেলে, বুঝিবা তোমার
শান্তি বাণী বিশ্বে আজ রাখিবে না আর ॥

( ৭ )

আজ তাই মন ভাঙ্গা দুঃখ মনে হায় !
শেষকালে সরে গেলে ছাড়িয়া ধরায়
সে দুঃখ দূরে যাবে
যদি কভু হয় তবে
তোমার অসীম বাণী মনে কাজে করি
বীরের বাঙ্গালা নাম বীর হয়ে ধরি ॥

( ৮ )

জগত মাঝারে যদি কভু স্থান হয়
পারে যদি প্রাণে প্রাণে বুঝিতে তোমায়
তবে হবে সত্য জয়
বাঙ্গালার সুনিশ্চয়
উপরে হইতে হেসে হাসাবে সবায়
সেই আশা মনে করে আঁখি মুছি হায় !

## রবীন্দ্রনাথের চিত্রাবলীর পরিচয়।

শ্রীজ্যোতি সেন।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন তাঁর ছবি নিজেই নিজকে প্রকাশ করবে—তার অর্থ বুঝিয়ে দিতে হবে না। প্রকৃত পক্ষেই তাঁর চিত্রাবলীর মধ্যে যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাব আছে তার ভাষ্যের প্রয়োজন নেই। চিত্রগুলি চিন্তার বাহন, একথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে।

কিন্তু সাধারণের কাছে চিত্রগুলি দুর্ব্বোধ্য কেন, এ বিষয়ে আলোচনা করলে বোধকরি অন্যায় হবে না।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রে প্রকৃতির প্রত্যক্ষ রূপ নেই। বাস্তবে আমরা প্রকৃতির যে রূপ দেখতে পাই তার যথাযথ রূপ তাঁর চিত্রে দেখতে পাই না। এখানে বাস্তব প্রকৃতি অবাস্তব ও অদ্ভুত হ'য়ে দেখা দিয়েছে। এজন্যে সাধারণের মনে সন্দেহ রয়েছে এগুলো চিত্র কি না! অনেকে এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকেও প্রশ্ন করেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জবাব দেননি। সাধারণের কৌতূহল নিবারণের জন্য রবীন্দ্রনাথ হয়ত বলতে পারতেন—এগুলো বাস্তবিকই ছবি, তবে বাস্তব ছবি নয়।

প্রকৃতির প্রতিচ্ছবি প্রস্তুত করাই যে রূপকলার চরম লক্ষ্য নয় একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

পূর্ব্বে য়ুরোপায় চিত্রশিল্পের একমাত্র লক্ষ্য ছিল প্রকৃতিকে রেখায় ও রঙ্গে পটের ওপর হুবহু অনুকরণ করা, অর্থাৎ প্রকৃতির প্রতিকৃতি আঁকা। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে আলোক-

চিত্রের আবিষ্কারে শিল্পীদের শিল্পসাধনায় সংশয় দেখা দেয়। বিস্মিত হ'য়ে তারা ভাবতে থাকে ফটোগ্রাফ ও পেন্টিংএ পার্থক্য কোথায়? পার্থক্যটা ধ'রে ফেলতে অবশ্য দেরী হবার কথা নয়। চিত্রের মধ্যে শিল্পীর সুবিন্যস্ত চিন্তার সুনিপুণ প্রকাশ সহজেই চোখে পড়ে। রূপকলার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান প্রবেশ করে' য়ুরোপীয় শিল্পীদের বুঝিয়ে দেয়—প্রকৃতির প্রতিচ্ছবি প্রস্তুত করাই চিত্র-রচনার চরম উদ্দেশ্য হ'তে পারে না।

তখন য়ুরোপের চিত্রশিল্পে এক আন্দোলন দেখা দেয়। জনকয়েক শিল্পী প্রচলিত রীতি ও গতানুগতিক ধারা বর্জ্জন করে' নূতন পদ্ধতিতে একেবারে ভিন্ন ধরণের চিত্র রচনা করতে থাকে। এসব চিত্রে প্রকৃতির প্রত্যক্ষ রূপ নেই। দেখলে মনে হয় যেন রেখা ও রঙ্গের ধাঁধাঁ। চিত্র সমালোচকগণ এই চিত্রগুলির নানা দিক পর্য্যালোচনা করে' এ ধারাটার নামকরণ করেছেন, Impressionism.

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চিত্র কতকটা এরূপ হ'লেও ঠিক এ শ্রেণীর নয়। কারণ প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার ঐতিহ্য অনুসরণ করে' তিনি চিত্র রচনা করেছেন। অবশ্য তাঁর রচনা পদ্ধতি স্বতন্ত্র।

রবীন্দ্রনাথ বস্তুবাদী ছিলেন না। বাস্তবিকতা তাঁর চিত্রে প্রাধান্য লাভ করেনি। বস্তুর সমাবেশে ভাবের পরিস্ফুরণই চিত্র রচনার মূখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং বস্তু ভাবের বাহন ছাড়া আর কিছু নয়। ভাব প্রধান চিত্রে বস্তুর প্রাধান্য থাকতে পারে না। ঠিক এই জন্যেই রবীন্দ্রনাথের চিত্রে প্রকৃতি তার যথাযথ রূপ ছেড়ে আসতে বাধ্য হ'য়েছে।

রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার ছাপ নিয়ে যে ছবির আবির্ভাব হ'য়েছে সে ছবি অনন্য সাধারণ সন্দেহ নেই, এই জন্যেই সাধারণের নিকট দুর্বোধ্য মনে হয়।

# রবীন্দ্র-প্রয়াণে।

শ্রীকুলদাকুমার সেন রায়স্য।

[illegible] রঙ্গপুর [illegible] প্রফেসর শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ গুপ্ত এম, এ মহোদয়ের সভাপতিত্বে গাইবান্ধায় অনুষ্ঠিত স্মৃতি সভায় ২১।৪।৪৮ বাং তারিখ পঠিত।

( ১ )

রবিরমলযশস্কঃ সত্যদর্শী নরর্ষিঃ।
স্বকিরণ চয়দীপ্ত্যা দ্যোতয়ন্ বিশ্বভূমিম্।
অহহ সময় যোগাৎ সাম্প্রতং দুঃস্থদেশাৎ
কবিকুলরবিরস্মাৎ প্রস্থিতোঽস্তাচলায়।

( ২ )

অতীন্দ্রিয়েষু প্রখরাহি দৃষ্টিঃ
সুদূর-সংসর্পিত-চক্ষুষস্তে।
উদ্ঘাট্য বিশ্বপ্রকৃতেরবোধ্যং
প্রাদর্শয়দ্ ব্রহ্ম-গতং রহস্যম্

( ৩ )

যশোধনানাং কবি-কুঞ্জরাণাং
ত্বমেব যূথাধিপতির্বরেণ্যঃ।
ত্বত্তো গৃহীত্বাহি বিভান্তু সর্বে
প্রজ্ঞা-প্রদীপ্তিং কবি-লেখকাশ্চ॥

( ৪ )

বিশ্বস্রষ্টুরনন্তপ্রেম-করুণা-ধ্যানেন নক্তন্দিবম্
আবাল্যাদ্ধি সহস্র-গীতি কবিতা-গানৈশ্চ সৌম্য ত্বয়া।
পীযূষ-ক্ষরি-লেখনীমুখভবৈর্লোকেষু বিজ্ঞাপিতম্—
উর্ব্বী-মঙ্গল-সিদ্ধয়ে মতিমতা,—"শান্তংশিবংসুন্দরম্"

( ৫ )

কেন্দ্রাদস্মাদ্ বিবস্বান্নভসি বিচরতঃ স্বগ্রহান্ কক্ষসংস্থান্
ক্ষুণ্ণাধ্বানং বিহায় প্রবলগতিবশাদ্ধাবতো ভিন্নমার্গে।
আকৃষ্ট্যা বিশ্বধর্ত্র্যা নিয়ময়তিবলাদপ্রমেয়স্থিরাংশ
স্ত্বপ্যাপি ভ্রষ্টমার্গান্ বিপথগমনুজান্ রক্ষসি হ্যাত্মশক্ত্যা ॥

( ৬ )

ত্বমসি ভব-বন্দিত ত্বমসি জন-নন্দিত
ত্বমসি কম-কবিতারসসিন্ধুঃ।
ত্বমসি কবি-ভূষণং ললিত কলা জীবনং
ত্বমসি ছন্দোগগনশরদিন্দুঃ ॥

( ৭ )

কথৎকর্ব্বহিত্রং লসচ্চারুচিত্রং
ধৃতি-ক্ষান্তিপূতং জগচ্ছান্তিদূতং।
মনস্তত্ত্ববিজ্ঞং জ্বলদ্দীপ্তিপুঞ্জং
কবি-শ্রেষ্ঠমর্চ্চ্যং ভবন্তং হি বন্দে ॥

ভুজঙ্গ প্রয়াতম্

( ৮ )

ভারত্যাস্ত্বংশ্রুতিসুখকরৈঃ সুস্বরৈঃ সম্প্রবুদ্ধঃ
সঙ্গীতৈ স্তৈর্মধুর-মধুরৈর্ভাবসম্পদ্ বিশিষ্টৈঃ।
সুপ্তাকাশং সুনিপুণতয়া পূর্য্যমাণংত্বকার্ষীঃ
নাট্যাচার্য্য ত্বমসি কুশলো বঙ্গ-রঙ্গাঙ্গনেষু ॥

( ৯ )

বাল্মীক্যাদিপ্রবরকবিভির্নন্দিতঃ সেব্যমানো
মন্দাকিন্যাস্তটজকুসুমৈর্বাসিত স্নিগ্ধবাতৈঃ।
বাণীকুঞ্জে গুণি-গণবৃতে মুগ্ধদিব্যাঙ্গনাভিঃ
প্রত্যুদ্যাতো বিচরিতুমলং মৃত্যুহীনোঽপি মুক্তঃ॥

( ১০ )

নৈবাহৃতং সুরভিনন্দন পারিজাতং
নীলোৎপলানি রুচিরাণি নচেতুমীশঃ
সিন্ধুংবগাহ্য সলিলাদ্ বরমৌক্তিকানি
চাহর্ত্তুমক্ষমতয়া ন হি তত্র লুব্ধঃ॥

( ১১ )

আস্বাবনাদ্বনমতঃ স্বয়মাহৃতানি
পুষ্পাণি চম্পকজবা-কমকেসরাণি।
রম্যাণিরক্তকমলান্যতিমুক্তকানি
চার্ঘ্যায় ভক্তিসহিতান্যুপকল্পয়ামি॥

( ১২ )

কবিতাকুসুমৈরেষা গ্রথিতা ভক্তিমালিকা।
গৃহ্যতাং কৃপয়া দেব, ত্বদুদ্দেশ নিবেদিতা॥

( ১৩ )

ধ্যানেধন-যোগিজন-চিত্ততটবাসিনী
কুঞ্জবন-রঞ্জন-সুমঞ্জুমধু-হাসিনী।
কাব্যরস-কামিগণ-কাম্যফলদায়িনী
ত্বামবতু নিত্যসিত-পদ্মদল-শায়িনী॥

( Translated from the original Sanskrit poem )

( ১ )

হায়, সুবিমলযশের অধিকারী সত্যদ্রষ্টা ঋষি-রবিকুলরবি রবীন্দ্রনাথ, স্বীয় প্রতিভা-কিরণের দীপ্তিতে বিশ্বভূমি সমুজ্জ্বল করিয়া অধুনা এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেশ হইতে অস্তাচলে প্রস্থান করিয়াছেন !

( ২ )

হে কবি, অতীন্দ্রিয় বিষয় সমূহে তোমার দৃষ্টি প্রখর ছিল—তোমার সেই সুদূর-সংসর্পিত চক্ষুর্দ্বয়ের দৃষ্টি, বিশ্বপ্রকৃতির দুর্বোধ্য ব্রহ্মগতরহস্য উদ্ঘাটন করিয়া প্রদর্শন করিয়াছে—অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত বিশ্বপ্রকৃতির যে নিগূঢ় যোগরহস্য রহিয়াছে, তাহা উদ্ঘাটন করিয়া লোক সমাজে প্রচার করিয়াছে।

( ৩ )

যশোবৈভব বঙ্গের কবি-কুঞ্জরগণের তুমিই একমাত্র বরেণ্য যূথাধিপতি ( চালক ) ছিলে। তোমার নিকট হইতেই প্রতিভাদীপ্তি গ্রহণ করিয়া তথাকার কবি ও লেখকগণ সমুজ্জ্বল হইতেছেন।

( ৪ )

বিশ্বস্রষ্টা ভগবানের অনন্ত প্রেম ও করুণারাশি নিশিদিন হৃদয়ে ধ্যান করিয়া বাল্যাবধি তুমি সহস্র সহস্র গীতি কবিতা ( lyrics ) ও সঙ্গীত রচনা করিয়াছ—অমৃতনিস্যন্দিনী লেখনী-সম্ভূত তোমার সেই সব কবিতা ও গান,—পৃথিবীর মঙ্গল সাধনোদ্দেশে লোকসমাজে "শান্তং শিবং সুন্দরম্" এর বাণী প্রচার করিয়াছে।

( ৫ )

নভোমার্গে বিচরণশীল দৃশ্যমান গ্রহচক্রের কেন্দ্রস্থলে থাকিয়া অপ্রমেয় স্থিরাংশ সূর্য্য, ( The sun of the measurable masses ) স্বীয় পরিবারস্থ গ্রহগণকে—যাহারা প্রবল-গতিবশতঃ কেন্দ্রাতিগ শক্তিবলে সর্ব্বদাই ক্ষুণ্ণমার্গ ত্যাগ করিয়া ভিন্ন পথে ধাবিত হইবার চেষ্টা করিতেছে—তাহাদিগকে বিশ্বধারণকারিণী আকর্ষণ শক্তিবলে ( আকৃষ্ট্যা বিশ্বধর্ত্র্যা ) নিয়ন্ত্রিত করিয়া পথভ্রষ্ট হইতে দিতেছেন না—তুমিও তদ্রূপ মানব সমাজের কেন্দ্রস্থলে থাকিয়া স্বীয় মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিবলে ভ্রষ্টমার্গ বিপথগামী মানবগণকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া রক্ষা করিতেছ।

( ৬ )

পৃথিবী তোমাকে বন্দনা করে, জনগণ তোমাকে নন্দিত করে, কমনীয় কবিতারসের তুমিই সিন্ধুস্বরূপ, তুমিই কবিগণের ভূষণ—ললিতকলাসমূহের তুমিই জীবন অথবা ললিতকলা সমূহই তোমার জীবনস্বরূপ—বাংলার ছন্দোগগনে তুমিই শরদিন্দুস্বরূপ !

( ৭ )

কথা সাহিত্যসাগরের তুমিই তরণীস্বরূপ—তোমার অঙ্কিত চারুচিত্রগুলি সমুজ্জ্বল হইয়া আছে—সহিষ্ণুতা, ক্ষমা প্রভৃতি সদ্গুণ সমূহে তোমার হৃদয় পবিত্রীকৃত—তুমি জগতের

শান্তিদূত--তুমি মনস্তত্ত্ববিদ্ দার্শনিক—তোমার প্রতিভা জ্বলন্ত জ্যোতিঃপুঞ্জ ( সূর্য্য ) স্বরূপ—তুমি কবিশ্রেষ্ঠ এবং অর্চ্চনীয়—তোমাকে বন্দনা করি।

( ৮ )

বাগেদবী কর্তৃক শ্রুতিসুখকর সুমধুর ধ্বনিতে প্রবুদ্ধ হইয়া তুমি ভাবসম্পদ্‌বিশিষ্ট যে সকল সুধাময় সঙ্গীত রচনা করিয়াছ তৎসমুদায়দ্বারা ( তোমার অসামান্য নৈপুণ্য বশতঃ ) বঙ্গের সুপ্ত আকাশকে তুমি পরিপুরিত করিয়াছ, অর্থাৎ কথা সুর ও ভাবের অপূর্ব্ব সমন্বয় দ্বারা আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়াছ।

( ৯ )

তোমার গুণে মুগ্ধা দিব্যাঙ্গনাগণ, প্রত্যুদগমন পূর্ব্বক তোমাকে গুণিগণ পরিবৃত বাণীকুঞ্জে লইয়া যাইবে, তথায় স্বর্গগঙ্গা মন্দাকিণী তটজাত কুসুমগন্ধে সুরভিত স্নিগ্ধ বায়ু তোমাকে সেবা করিবে—বাল্মীকি কালিদাস প্রভৃতি প্রবর কবিগণ কর্তৃক অভিনন্দিত হইয়া, মৃত্যুহীন হইয়াও পার্থিব বন্ধন হইতে মুক্ত তুমি তথায় তাঁহাদের সাহচর্য্যে সুখে বিচরণ করিতে পারিবে।

( ১০ )

তোমাকে পূজা করিতে আমি নন্দন কানন হইতে সুরভি পারিজাত পুষ্প আহরণ করি নাই—সরোবর হইতে সুচারু নীলোৎপল চয়ন করিতেও আমি সমর্থ হই নাই—সিন্ধুগর্ভে অবগাহন পূর্ব্বক সলিল হইতে উৎকৃষ্ট মুক্তা সমূহ আহরণ করিতেও আমি অক্ষম, সুতরাং সেজন্য আমি প্রলুব্ধ হই নাই।

( ১১ )

বন হইতে বনান্তরে ভ্রমণ করিয়া স্বয়ং আহরণ পূর্ব্বক আমি চম্পকজবা এবং কমনীয় বকুল পুষ্প সংগ্রহ করিয়াছি সরোবরে রমণীয় রক্তকমল এবং উদ্যান হইতে মাধবী কুসুম চয়ন করিয়া তৎসমুদায় দ্বারা আমি ভক্তিসহকারে তোমার জন্য অর্ঘ্য রচনা করিয়াছি।

( ১২ )

কবিতা কুসুমে গ্রথিত এই ভক্তিমালা আমি তোমারই উদ্দেশে নিবেদন করিয়াছি, হে দেব, তুমি দয়া করিয়া ইহা গ্রহণ কর।

( ১৩ )

ধ্যানপরায়ণ যোগীজনের চিত্ততটবাসিনী কবিকুঞ্জরঞ্জনকারিনী মঞ্জুমধুরহাসিণী কাব্যরস-পিপাসুগণের কামাফলদায়িণী—নিত্যসিত-পদ্মদলশায়িণী ভগবতী বীণাপাণি তথায় তোমাকে রক্ষা করুন।

এই বঙ্গানুবাদ কামারজানিতে অনুষ্ঠিত স্মৃতিসভায় পঠিত হইয়াছিল

# বাঙ্গালার রবীন্দ্রনাথ

অধ্যক্ষ শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, এম্, এ, বি, এল ।

আজ বৎসরাধিক কাল অতীত হইয়া গেল রবীন্দ্রনাথের তিরোধান হইয়াছে। এখনও যেন মনে হয় এই ত মাত্র সেদিন কলিকাতা হইতে সেই নিদারুণ বার্ত্তা আসিয়া বাঙ্গালার আবালবৃদ্ধ-বণিতাকে শোকে মুহ্যমান করিয়া ফেলিল। রবীন্দ্রনাথ যে আমাদের মধ্যে সত্য সত্যই নাই, এ কথাটা যেন আমরা এখনও উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। পারিবার কথাও নয়, কারণ বাঙ্গালী জাতির অন্তরের অন্তরতম স্থল পর্য্যন্ত এমন ভাবে আন্দোলিত, আলোড়িত, উদ্বেলিত করিতে আর কেহই পারেন নাই। আমাদের বাক্যের বিন্যাস, রচনার ভঙ্গী, চিন্তার ধারা পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথ নিয়মিত করিয়াছেন—এক নূতন খাতে প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ এই প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া বাঙ্গালী জাতি যেন রবি-ময় জগতেই বাস করিয়া আসিতেছে। এক আধ বৎসরে ত রবির সে প্রভাব বিলুপ্ত হইবার নহে।

আর সে প্রভাব ত শুধু এক দিক্ দিয়া নহে। কাব্যে, গানে, গল্পে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে, নাটকে, গদ্যে, পদ্যে—এক কথায় সাহিত্যের সমস্ত বিভাগেই তাঁহার স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রতিভা অপরূপ বিকাশ লাভ করিয়া তাঁহার দেশবাসীকে চমৎকৃত করিয়াছে, অভিভূত করিয়াছে। বৈজ্ঞানিক আলোচনা, অর্থনৈতিক আলোচনা, ঐতিহাসিক আলোচনাও তিনি যথেষ্ট করিয়াছেন—অতি সরস বিচিত্র ভঙ্গীতে। অধ্যাত্ম-জগতের অতি সূক্ষ্ম অতি গভীর তত্ত্বরাজি তাঁহার অন্তর্লোককে উদ্ভাসিত করিয়া তাঁহার গান, তাঁহার কথা, তাঁহার উপদেশাবলীর মধ্য দিয়া জ্যোতির্ম্ময় ধারার ন্যায় প্রবাহিত হইয়াছে। এই সমস্তকেও অতিক্রম করিয়া যাহা রবীন্দ্রনাথকে বাঙ্গালীর একান্ত প্রিয়, একান্ত আপনার জন করিয়াছে, তাহা হইল তাঁহার প্রগাঢ় দেশভক্তি—দেশের সাধনার, সভ্যতার, আদর্শের প্রতি তাঁহার অবিমিশ্র শ্রদ্ধা—নিজেদের জাতি ও সমাজের সম্পর্কে তাঁহার সুগভীর আত্মমর্য্যাদাবোধ।

কিন্তু দেশের প্রতি ভক্তি, জাতির প্রতি শ্রদ্ধা, তাঁহার উদার চিত্তে কোন সঙ্কীর্ণতা আনয়ন করে নাই—কূপমণ্ডূকের "স্বাদেশিকতা" তাঁহার ছিল না। আমাদের দেশ ও জাতিই সমস্ত উৎকর্ষের আধার, অন্যান্য দেশ ও জাতির নিকট হইতে আমাদের কিছুই শিখিবার নাই—এই সুলভ আত্মম্ভরিতা তাঁহার ছিল না। বিশ্বের বিপুল বিস্তৃত ইতিহাসে নানা জাতি নানা দেশই মানব-

সভ্যতার বেদীতে কত বিচিত্র অর্ঘ্যসম্ভার উৎসর্গ করিয়াছে—এই পরম সত্যকে তাঁহার উন্মুখ চিত্ত কোনদিন অস্বীকার করে নাই। এই অর্থে তিনি সত্য সত্যই ছিলেন বিশ্ব-নাগরিক বিশ্ব-কবি। কিন্তু এই উদার উন্মুখতা তাঁহাকে কোনদিন আত্ম-হারাও করে নাই। বিশ্বের এই মহাসঙ্গীতির মধ্যে আমাদের দেশের, আমাদের জাতির, আমাদের সভ্যতার যে একটা বিশিষ্ট সুর আছে, তাহা তিনি কোনদিন বিস্মৃত হন নাই। ভারতবর্ষের যে একটা বিশিষ্ট সাধনা আছে, ভারতীয় সভ্যতার যে একটা বিশিষ্ট আত্মা আছে—এই জ্ঞান চিরকাল পরিপূর্ণ মাত্রায় তাঁহার মনে জাগরূক ছিল। তাই নববর্ষের গানে কবি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গাহিয়াছিলেন,

রাজা তুমি নহ হে মহা তাপস  
তুমিই প্রাণের প্রিয়।  
ভিক্ষাভূষণ ফেলিয়া পরিব  
তোমারই উত্তরীয়।  
দৈন্যের মাঝে আছে তব ধন  
মৌনের মাঝে রয়েছে গোপন  
তোমার মন্ত্র অগ্নিবচন  
তাই আমাদের দিয়ো।  
পরের সজ্জা ফেলিয়া পরিব  
তোমারই উত্তরীয়॥

যে অভিধা সহযোগে একদা রবীন্দ্রনাথ দেশভক্ত আত্মযোগী শ্রীঅরবিন্দকে নমস্কার করিয়াছিলেন—"স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্ত্তি তুমি"—সেই অভিধা তাঁহার নিজের প্রতিও তুল্যরূপেই প্রযোজ্য। স্বদেশ-আত্মার এই প্রগাঢ় অনুভূতিই তাঁহাকে স্বদেশের সঙ্গে একাত্ম করিয়াছিল—স্বজাতির সম্পর্কে তাঁহার মর্য্যাদাবোধ এত প্রখর করিয়াছিল। এই তীব্র আত্মসম্মানবোধেই তিনি গাহিয়াছিলেন,

পরের ভূষণ পরের বসন  
তেয়াগিব আজ পরের অশন  
যদি হই দীন, না হইব হীন,  
ছাড়িব পরের ভিক্ষা।  
নব বৎসরে করিলাম পণ  
লব স্বদেশের দীক্ষা॥

রবীন্দ্রনাথের চিত্ত ছিল কবিচিত্ত। তাঁহার অনুভূতি ছিল অতি সূক্ষ্ম অতি তীব্র অতি প্রখর। তাই কেহ যদি তাঁহার জাতির তাঁহার দেশের আত্মসম্মানে কিছুমাত্র আঘাত করিত, অনুগ্রহ দেখাইতে আসিত, তখন ব্যথিতচিত্তে তিনি বলিয়া উঠিতেন,

অনুগ্রহ ক'রে এই ক'রো  
অনুগ্রহ ক'রো না আমায়;

আর দৃপ্ততেজে রুদ্রমূর্ত্তিতে তিনি সে আঘাত সে অপমানের প্রতিঘাত করিতেন। জাতীয় জীবনের প্রতি সঙ্কট-মুহূর্ত্তে তাই স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্ত্তিরূপে রবীন্দ্রনাথ দেশকে সত্যের পথে সম্মানের পথে, মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে কম্বুকণ্ঠে আহ্বান করিতেন। জাতিও তাই, রবীন্দ্রনাথকে একান্ত আপনার জন বলিয়া জানিত।

বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বাঙ্গালীর, ছিলেন বাঙ্গালার। বাঙ্গালার হাট-মাঠ-ঘাট, বাঙ্গালার পল্লীর শ্যামল শোভা, বাঙ্গালার নিসর্গ-সৌন্দর্য্য বাঙ্গালার বিচিত্র ঋতুসম্ভার তাঁহার কবিচিত্তকে আকুল করিয়া তুলিত। নিজেই সেকথা অকপটে ব্যক্ত করিয়াছেন :

আমার সোণার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।

আবার গদ্‌গদ হইয়া গাহিয়াছেন,

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।
সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালবেসে॥
আঁখি মেলে তোমার আলো প্রথম আমার চোখ জুড়ালো।
ঐ আলোতেই নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে॥

বিধাতার আশীর্ব্বাদে কবির সে ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে—বাঙ্গালার রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালার আলোতেই নয়ন রাখিয়া নয়ন মুদিয়াছেন—গাঙ্গেয় রবীন্দ্রনাথ পুণ্যগঙ্গাতটেই দেহরক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার অমর আত্মা আশীর্ব্বাদ করুন যেন তাঁহার দেশবাসী স্বদেশ-আত্মার কোনদিন অবমাননা না করে। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

# কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণে

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

তমসা মগন বাঙ্‌লা যখন, সুপ্ত বাঙ্গালী ঘরের কোণে,
লাঞ্ছনা ভরা জাতির জীবনে বেদনার শত অশনি হানে,
রাষ্ট্র জীবন চেতনা বিহীন, ভাষার দৈন্য করিতে দূর,
বাণীর সেবক ছিলনা যখন শৃঙ্খল ভার করিতে চূর,
ছিল শুধু যবে ভীরু অপবাদে নিরাশার ঘন ঘোরে,
লাজ, ভয় ভরে বাঙ্গালীর মন কতদিন, যুগ ধরে.
সেদিন দুখের রজনীর শেষে জাতির কোন্ সে পুণ্যফলে,
বাঙ্‌লা-গগন উঠিল হাসিয়া তরুণ রবির রশ্মি-জালে।
সহসা জাগিল দেশবাসী তাঁর আঁধার কুটীরে আলোক দেখি,
বাঙ্গালীর নামে উঠে জয়ধ্বনি. এওকি কখনো সত্য নাকি!
গহন কাননে যে ফুল ফুটিল তাহারি সুবাস এত কি মধুর,
মৃগনাভি-ভরা-কস্তুরী সম গন্ধে আমোদ করিল সুদূর।
দলে দলে যত গর্ব্বিত শির নুইয়া পড়িল ভূমির পরে,
লেগে গেল ধুম বাঙ্গালী কবির চরণ-ধুলির পরশ তরে।
মিথ্যার বুকে পদাঘাত করি শোনালো যে কবি সত্যের বাণী,
ভ্রূকুটি-কুটিল রক্ত আঁখির তাড়নেও নাহি শঙ্কা মানি,
হাহাকারে যাঁর কাঁদিল পরাণ নির্য্যাতিতের অশ্রু হেরি,
কীটানুকীটের ব্যথাটীও যাঁর পরশ পাইল মূর্ত্তি ধরি,
বিশ্ব মানবে যে কবি শেখালো বাঁধিতে প্রেমের বাহুর ডোরে,
আঁকিয়া দিল যে ছবিটী মহান্ দার্শনিকের তুলিকা ধরে।
শিল্পের রাজা, বাণীর পূজারী, বিশ্ব-ভারতী-ভাণ্ডারী,
শ্রেষ্ঠ আসন লভিল জগতে মানব সভার কাণ্ডারী।

বিজয় রথের চক্র তাঁহার চলিল জগতে ঘর্ঘরি,
বিস্ময় ভরা রুদ্ধ নিশ্বাসে ত্রিভুবন চাহে শিহরি।
দ্বিপ্রহরের তীব্র রবির তীক্ষ্ণ প্রখর দীপ্তিতে,
জাতির গ্লানি মুছিয়ে দিল রুদ্রনাথের শক্তিতে!
অস্তরবির শেষ কিরণেও অনলের শিখা নিয়া,
দেখালো জগতে সকল জাতিকে চলিবে যে পথ দিয়া।
মহাপ্রয়াণের পথে যেতে কবি যাহা করে গেল দান,
কত কোহিনুর—মহামণি কত, কীসে তার পরিমান*।

## কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ।

শ্রীকেশবলাল বসু, বিদ্যাবিনোদ সাহিত্যরত্ন

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে অল্পসময়ে দু-চারি-কথায় কোন কিছু বল্‌তে যাওয়া যে কতদূর ধৃষ্টতার বিষয়, তা বিশেষভাবে উপলব্ধি ক'রেও এই ধৃষ্টতার পরিচয় দিতে অগ্রসর হ'তে হয়েছে, কারণ আহ্বান এসেছে এমন দিক থেকে, যেখানে "না" বলবার উপায় নেই। যেখানে পদে পদে বিচ্যুতি ও প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা, সেখানে স্বভাবতঃই এমন একটা সঙ্কোচ, এমন একটা ভীতি এসে উপস্থিত হয়, যাতে হৃদয়ের স্বাভাবিক ভাব আত্মবিকাশ ক'রতে চায় না—খাঁচার ভিতর আবদ্ধ পাখীর মতো সে ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে—সে চায় অনাদি অসীম মুক্ত নীল আকাশে ছুটে যেতে—আর চারিদিকের নির্দ্দয় লৌহপিঞ্জর করতে থাকে নির্ম্মমভাবে আঘাত। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বতোমুখী প্রতিভার কথা যখনই ভাবতে যাই, তখন মনে হয়, আমরা সহসা এমনি একটা

*১২ই আগষ্ট তারিখে রঙ্গপুর পাব্লিক লাইব্রেরী প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত শোক সভায় পঠিত।

উদ্যানের মধ্যে এসে পড়েছি, যেখানে অসংখ্য বর্ণের, অসংখ্য জাতির ফুল গন্ধে, মাধুর্য্যে, অতুলনীয় শোভা সম্পদে আমাদিগকে আকুল করে তুলেছে—আপনাকে হারিয়ে গেছি। সুকবি, শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক, লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিত্রকর, সুবক্তা প্রত্যেকেরই সুনিয়মিত কার্য্যক্ষেত্র এক.—বিশ্ব-প্রকৃতিকে সঠিকভাবে জীবন্ত আকারে আমাদিগের চক্ষের সাম্‌নে ফুটিয়ে তোলা। এতে যিনি যত নিপুণতা বা দক্ষতা প্রকাশ কর্‌বেন, আমরা তাকে তত বড় শিল্পী বা আর্টিষ্ট বলে মেনে নেবো। সৃষ্টি শিল্পীর আর একটা বড় কাজ। বিজ্ঞান বল্‌বে প্রকৃতি সৃষ্টির প্রারম্ভ হতে তার যে সীমাবদ্ধ বেসাতি নিয়ে কাজ সুরু করে দিয়েছে, তার ধ্বংস নেই, "Matter is indestructible," কিন্তু এই ধ্বংসশীল প্রকৃতিকে বর্ণে গন্ধে মাধুর্য্যে অতুলনীয় করে তুলে মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে নিয়োগ করাই শিল্পীর প্রধান কার্য্য। রবীন্দ্রনাথের রচনায় শিল্পীর এই শিল্পচাতুর্য্য কতদূর পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, তা বোধ হয় কাউকে বুঝিয়ে বল্‌তে হবে না।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ছন্দের রাজা। সুনিপুণ মৃৎশিল্পী যখন কাদা দিয়ে সুন্দর জীবন্ত মূর্ত্তি গড়ে তুলে, তখন আমরা শিল্পীর হাতে গড়া সেই মূর্ত্তির সৌন্দর্য্য ভাব্‌তে ভাব্‌তে যে কাদা দিয়ে তাকে গড়ে তোলা হয়েছে, তার কথা ভুলে যাই—আবার সেই মূর্ত্তি যখন ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়ে, রসের সংমিশ্রণে পুনরায় কর্দ্দমে পরিণত হয়, তখন তার দিকে ফিরেও চাই না।

"সন্ন্যাসী উপগুপ্ত,
মথুরা পুরীর প্রাচীরের তলে
একদা ছিলেন সুপ্ত ;
নগরের দীপ নিবেছে পবনে
দুয়ার রুদ্ধ পৌর ভবনে,
নিশীথের তারা
শ্রাবণ গগণে ঘন মেঘে অবলুপ্ত।"

"গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা,
একা কূলে বসে আছি নাহি ভরষা ;
রাশি রাশি ভারা ভারা
ধান কাটা হল সারা,
ঘর নদী ক্ষুর ধারা খর পরশা,
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা।"

পড়্‌তে পড়্‌তে শ্রাবণ গগনের "ঘন মেঘে অবলুপ্ত"—প্রকৃতির ও মেঘ সমাচ্ছন্ন গগনতলের নিম্নদেশে খরস্রোতা তরঙ্গিণীর চিত্র কি জীবন্তভাবে ফুটে উঠে না।

রবীন্দ্রনাথের রচনার আর একটি বৈশিষ্ট্য তাঁহার স্বাদেশিকতা। জাতির জীবন প্রবাহ

যখন যে পথে পরিচালিত হয়েছে, তখন তিনি তার ঊর্দ্ধদেশে দণ্ডায়মান হ'য়ে দেশ ও জাতিকে সেই পথের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দিয়েছেন। স্বদেশী যুগের রবীন্দ্রনাথের

"এক দেশ, এক ভগবান,
এক জাতি, এক মনপ্রাণ।"

সেই ১৯০৫ সাল হ'তে এখন পর্য্যন্ত আমাদের কর্ণে নানাভাবে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হ'য়ে আসছে।

"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
একলা চলরে"

এই "একলা চলার" আহ্বান আমাদের জীবনে প্রতিমুহূর্ত্তে কিরূপ সত্যিকারভাবে উপস্থিত হচ্ছে, আমাদিগকে নানাভাবে উদ্বোধিত করে তুলছে, তাকি আমরা কখনও চিন্তা করে দেখেছি? যদি চিন্তা করে থাকি, তবে তারই মধ্য দিয়ে আমাদের জীবনের সন্ধান পেয়েছি, এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের স্বর্গারোহণের পর হ'তে একটি বৎসর অতিবাহিত হ'য়ে গিয়েছে—এই একটি বৎসরের মধ্যে আমরা তাঁর নির্দ্দিষ্ট পথে কতদূর অগ্রসর হ'তে পেরেছি, তা কি একবার ভেবে দেখবনা। যদি ভেবে না দেখি, তবে বোলবো তাঁর প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ দেশময় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে গিয়েছেন,। যদি আমরা সেই স্ফুলিঙ্গ থেকে দুই চারিটা কণাও কুড়িয়ে নিতে না পেরে থাকি, তবে সে দোষ তাঁর নয়—জাতির। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "কথা ও কাহিনীর" মধ্য দিয়ে যে দুই চারিটা চিত্র আমাদের চক্ষের সম্মুখে ধরেছেন, আজ বাঙ্গালার কাব্যামোদী সাহিত্যিক বৃন্দের কয় জন তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ রে বাঙ্গলার তথা ভারতের জাতীয় ইতিহাসের মধ্য হ'তে কয়টি চিত্রকে তেমন ভাবে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা পেয়েছেন?

"বন্ধু তোমরা ফিরে যাও ঘরে,
এখনও সময় নয়,
গুরুগোবিন্দ কহিলা ডাকিয়া—
অনুচর গুটি ছয়।
যাও রামদাস, যাও গো লেহারি,
সাহু ফিরে যাও তুমি,
দেখাও না লোভ, ডাকিও না মোরে,
ঝাপায়ে পড়িতে কর্ম্ম সাগরে,
এখনও পড়িয়ে থাক বহুদূরে
জীবন রঙ্গভূমি।

নীরব লোক লোচনের অন্তরালে স্বদেশের জন্য এই যে সাধনা, "বন্দীবীর" ও "বিচারকের" মধ্য দিয়ে দেশের জন্য আত্মত্যাগ ও স্বার্থত্যাগের অপূর্ব্ব চিত্র, আজ আমরা কি "উন্মাদ কোলাহলের" মধ্য দিয়ে এই সকলের উপযোগিতা ভুলে গিয়ে কথা সাহিত্যের এই কয়টি চিত্র নিয়ে আত্মগৌরব অনুভব কোরবো—এই পথে আর অগ্রসর হব না? আমি এমন কথা বোল্‌তে চাই না—আমরা রবীন্দ্রনাথের পদাঙ্ক অনুসরণে অযোগ্যতা প্রদর্শন করেছি—আমার বোলবার কথা এই যে, আমাদের অগ্রগমন আরও দ্রুত হওয়া প্রয়োজন। দেশ ও জাতির প্রয়োজনে আজ আমরা যদি সুষ্ঠুভাবে সাড়া দিতে পারি, তবেই বুঝবো আজ কবির মৃত্যুতিথি পালনের অনুষ্ঠান সার্থক হয়েছে।

দেশ ও জাতির মরম বেদনাকে যতদিন আমরা সার্থকভাবে উপলব্ধি কোর্‌তে না পার্‌বো ততদিন বুঝ্‌ব আমরা রবীন্দ্রনাথকে প্রকৃতভাবে ধর্‌তে পারিনি। আজ দেশ ও জাতির সম্মুখে যে দুর্দ্দিন বা সুদিনের ছায়া ঘনিয়ে আস্‌ছে, তাতে আমরা কি কোরবো? রবীন্দ্রনাথ তারও ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছেন:—

"আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না,
একি শুধু হাসি খেলা,
প্রমোদের মেলা,
শুধু হাসি খেলা ছলনা?
এসেছি কি হেথা যশের কাঙ্গালী
কথা গেথে গেথে নিতে করতালি?"

আজ আমাদের বিজয়লব্ধ আনন্দের দিন নয়। আজ আমাদের সম্মুখে যে সুস্পষ্ট সংগ্রামের আহ্বান এসেছে, এতে জয়লাভ করে আমাদিগকে বিজয়মাল্যের অধিকারী হতে হবে।

"সেদিন প্রভাতে তরুণ তপন,
নবীন কিরণ করিবে বপন,
এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন,
আসিবে সেদিন আসিবে।"

# রঙ্গপুর পরিষৎ গ্রন্থাবলী।

১। **গৌড়ের ইতিহাস।** প্রথম খণ্ড। (হিন্দুরাজত্ব)

মালদহের সুযোগ্যপণ্ডিত ৺রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় সঙ্কলিত এই ইতিহাসগ্রন্থ সভার গ্রন্থাবলীভুক্ত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য কাগজের মলাট ৸০ এবং সুন্দর বাঁধাই করা ১৲ টাকা

২। **বগুড়ার ইতিহাস।** (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)

শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন বি, এল মহাশয় রচিত এই গ্রন্থে সমগ্র বগুড়ার যাবতীয় বিবরণ গ্রন্থকার কর্ত্তৃক বিস্তৃতভাবে সঙ্কলিত হইয়াছে। মূল্য ৸০ ও ১।০ এই সভার সদস্যগণের পক্ষে ।৶০ ও ‖৶০ আনা মাত্র।
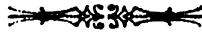
# সাহি ্য সেবকগণের শুভ সুযোগ

## রঙ্গপুর সাহিত্যপরিষৎ হইতে প্রকাশিত।

(১) অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ; (২) চণ্ডিকাবিজয়; (৩) আহ্নিকাচার তত্ত্বাবশিষ্ট; (৪) নিমাই চরিত; (৫) সত্যনারায়ণের পাঁচালী; (৬) কর্পূরস্তব, অনুমান ১১০০ এগার শত পৃষ্ঠার এই ছয়খানি পুস্তক তিন টাকার স্থলে দেড় টাকায় বিক্রয় করা হইতেছে। যাঁহারা সম্পূর্ণ সেট ক্রয় করিতে অনিচ্ছুক, তাঁহাদিগকে প্রত্যেক গ্রন্থের জন্য অর্দ্ধমূল্য প্রদান করিতে হইবে। যাঁহারা অন্ততঃ এক সেট গ্রন্থ ক্রয় করিবেন, তাঁহাদিগকে কামরূপ, গৌরীপুর, মালদহ, পাবনা ও রাজসাহী অধিবেশনের দেড় সহস্রাধিক পৃষ্ঠার সচিত্র কার্য্যবিবরণ ও সম্মিলনে পঠিত প্রবন্ধাবলী সমন্বিত গ্রন্থরাজি প্রয়োজনীয় ডাক মাশুল ও প্যাকিং মাত্র লইয়া প্রদান করা হইবে। বলা বাহুল্য সর্ব্বপ্রকার পুস্তকেরই ডাক মাশুল গ্রাহকের দেয়। গ্রন্থের সংখ্যা অধিক হইলে রেলওয়েযোগে পুস্তক গ্রহণ করা সুবিধাজনক। পূর্ব্বোক্ত পূর্ণ সেট গ্রন্থ ক্রেতৃদিগকে রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার পুরাতন খণ্ডগুলি ৩৲ তিন টাকা স্থলে দেড় টাকায় প্রদান করা হইবে। অন্যথা অর্দ্ধমূল্য প্রদান করিতে হইবে। রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিলে গ্রন্থাদি প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির
রঙ্গপুর।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী ধর্ম্মভূষণ
সম্পাদক।

# বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের রঙ্গপুর-শাখার নিয়মাবলী।

১। উত্তরবঙ্গ ও আসামের প্রত্নতত্ত্ব, প্রাদেশিক ভাষাতত্ত্ব, কৃষি-শিল্পতত্ত্ব, সম্ভ্রান্তবংশীয়গণের ইতিবৃত্ত প্রাচীন অপ্রকাশিত দুষ্প্রাপ্য হস্তলিখিত পুঁথিগুলির উদ্ধার এবং কবিগণের বিবরণ-সংগ্রহ, প্রাচীন কীর্ত্তিরক্ষা ও বিবিধ উপায়ে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন ও উন্নতি সাধনার্থ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, রঙ্গপুর শাখা স্থাপিত হইয়াছে।

(২) যে সকল মহানুভব ব্যক্তি এই সভার স্থায়ী ধনভাণ্ডারে এককালীন পাঁচশত বা তদূর্দ্ধ পরিমিত অর্থ দান করিবেন, তাঁহারা সভার আজীবন সদস্য ও পরিপোষকরূপে পরিগণিত হইবেন।

৩। বাঙ্গালা সাহিত্যানুরাগী শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই এই সভার সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচিত হইতে পারেন। নির্ব্বাচনের প্রণালী মূল সভার অনুরূপ। যথারীতি নির্ব্বাচনের পর সম্পাদক নির্ব্বাচিত ব্যক্তির নিকটে সংবাদসহ একখানি "সদস্যপদ-স্বীকারপত্র" স্বাক্ষর জন্য পাঠাইয়া দিবেন। নির্ব্বাচনের তারিখ হইতে [illegible] সদস্য-পদ-স্বীকার-পত্রের শূন্য অংশগুলি পূর্ণ করিয়া ১৲ টাকা প্রবেশিকা ( রঙ্গপুরবাসী [illegible] সদস্যের পক্ষে ) বা চারি মাসের অগ্রিম চাঁদা ন্যূনকল্পে ১৲ টাকা ( কেবল শাখা-সভার সদস্যের পক্ষে ) সম্পাদকের নিকটে পাঠাইলে তাঁহাকে সদস্য-শ্রেণীভুক্ত করা হইবে।

৪। মূল ও শাখা-পরিষদের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ উভয় সভার সদস্যকে মাসিক অন্যূন ॥০ আনা এবং শাখা-পরিষদের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ কেবল শাখা-সভার সদস্যকে মাসিক অন্যূন ।০ আনা চাঁদা দিতে হয়। অধিক হইলে আপত্তি নাই, সাদরে গৃহীত হইবে। উভয় সভার সদস্যগণ মূল ও শাখা উভয় সভার যাবতীয় অধিকারসহ প্রকাশিত পত্রিকাদি বিনামূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। শাখা সভার সংগৃহীত যাবতীয় গ্রন্থ ও পত্রিকাদি পাঠের অধিকার উভয় প্রকারের সদস্যগণেরই থাকিবে।

৫। এতদ্ব্যতীত যাঁহারা সাহিত্যসেবায় ব্রতী থাকিয়া বিশেষভাবে শাখা-পরিষদের উপকার করিবেন, তাঁহারা চাঁদা দিতে অক্ষম হইলেও, এই সভার অধ্যাপক বা সহায়ক সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন। এরূপ সদস্যকে সভার উদ্দেশ্য সম্পূরণ জন্য কোনও না কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হইবে। নির্ব্বাচনের প্রণালী মূল সভার অনুরূপ।

৬। সদর সদস্যগণের নিকট তাঁহাদের ইচ্ছাক্রমে মাস মাস বা বর্ষ-মধ্য ও শেষভাগে চাঁদার খাতা পাঠাইয়া দিয়া চাঁদার টাকা গৃহীত হয়। মফঃস্বলের সদস্যদিগের নিকট বর্ষ-মধ্য ও শেষভাগে ভি, পি, যোগে পত্রিকাদি পাঠাইয়া চাঁদার টাকা লওয়া হয়। এইরূপে বৎসরের চাঁদা বৎসরের মধ্যে শোধ করিয়া না দিলে কেহ পত্রিকাদি প্রাপ্তির দাবী করিতে পারিবেন না। উভয় সভার সদস্যের দেয় অন্যূন ॥০ চাঁদার অর্দ্ধাংশ মূল সভা এবং অপরার্দ্ধাংশ শাখাসভা স্ব স্ব পত্রিকাদি উক্ত প্রকারে ভি, পি, যোগে প্রেরণ পূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন। মূল সভা হইতে প্রকাশিত পত্রিকা ও গ্রন্থাদি মূল সভা এবং শাখা-সভা হইতে প্রকাশিত পত্রিকা ও গ্রন্থাদি শাখা সভা স্ব স্ব ব্যয়ে বিতরণ করিবেন।

৭। কেবল রঙ্গপুরবাসীর একত্রে মূল ও শাখা উভয় সভার সদস্যপদ গ্রহণের অধিকার আছে। যে সকল সদস্য ১৩২০ সালের পূর্ব্বে উভয় সভার অধিকার পাইয়াছেন, তাঁহারা রঙ্গপুরের অধিবাসী না হইলেও তাঁহাদের উভয় সভার অধিকারাদি অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

৮। রঙ্গপুর শাখা-পরিষদের অন্যান্য যাবতীয় নিয়ম মূল সভার অনুরূপ।

সভাসম্পর্কীয় টাকা ও বিনিময়পত্রাদি নিম্নোক্ত ঠিকানায় সভার সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী শর্ম্মভূষণ, সম্পাদক।
রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির, রঙ্গপুর।